কাজল শাহনেওয়াজ

শে

কাজল শাহনেওয়াজ

শে

Shey—A Novel by Kajal Shaahnewaz

ISBN: 978-984-95374-2-7

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০২১

প্রকাশক: উড়কি
বাড়ি: ৪৪৭/এ, রোড-৭
বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা-১২০৬
ফোন: +8801713305123
e-mail: info@urki.com
www.urki.com

প্রচ্ছদ: শাহিনুর রহমান

পরিবেশক
বাতিঘর
প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড চট্টগ্রাম-৪০০০।
ফোন: ০১৭৩৩৩০৬৭০০৫

মুদ্রণ
সংবেদ প্রিন্টিং পাবলিকেশন, ৮৫/১, ফকিরেরপুল, ঢাকা ১০০০

মূল্য: টাকা ২০০/-

উৎসর্গ

সর্বংসহা বাংলাভাষাকে!

বাংলা ভাষায় স্ত্রী-বাচক সর্বনাম নাই
তাই আমি নারী ‘সে’ কে পাল্টে করেছি ‘শে’

সমূহ জ্ঞান প্রকৃত অভিজ্ঞতায় আসে। কারন ব্যাখ্যা করে তাতে কিছু আসে না। উপলব্ধিজাতও না। যেমত কেউ মধুর মিষ্টত্ব, ধৈর্যের তিক্ততা, যৌনসংগমের মিলন, প্রেম, আবেগ বা আকঙ্খা অভিজ্ঞতা ছাড়া পায় না।
- ইবনে আরাবি

।১।

এই মৃত্যু জরজর অদৃষ্টবাদী সিন্থেটিক ঢাকা শহরের ক্লান্তি ও হতাশা সারাদিনই গ্রীষ্মকালীন শাদা ছোট ফুলের মত রাস্তার ডিভাইডারে বেঁচে ওঠে। কিছুতেই আশাবাদী হওয়া যায় না। তবু কোন না কোন ফুল ফুটে ওঠে। কত হাজার লক্ষ ময়মুরুব্বি এই শহরটাকে গঠন করেছেন, তাদের কে-ই বা মনে রেখেছে। দালানকোঠা ধ্বংস হয়ে য়ায়, মানুষের কীর্তিকাহিনী মিশে যায় রাস্তার নিচে। নতুন পথ সৃষ্টি হয়!

মানুষের মন আর মস্তিষ্ক আলাদা বলে মনে হলেও, মনটা মস্তিষ্কজাত বলেই ধরে নেয়া হয়। কিন্তু সম্পূর্ন মস্তিষ্ক জাগ্রত হবার আগেও মানুষের উপ-মন তৈরি হয়েছে। তারপর নিম-মন। একটা গোপন একান্ত কোষীয় অবস্থা থেকেই মানুষের মন আছে। হয়তো যখনি প্রাণ, তখনি মন তৈরি হয়েছে। সেই আদিম মনের সবটাই নিগুঢ় মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে রয়েছে। একটা পাতলা উত্তরাধূনিক পরাবাস্তবতা শুধু সব কিছুর উপর টাদর হয়ে ফিনিশিং দিয়া রাখছে। শাদা চোখে সেই মনটাকে নিয়াই আমরা বাঁচি। সেই মনটার প্রভাবে থাকি।

একদিন রূপা তুমি এলে আশ্বিনে কাশফুলের উড়ে আসা বীজের মত। আমার টবে, হালকা রোমের সাথে উড়ে উড়ে। প্রায় দেখাই যায় না এমন একটা সম্ভাবনার বীজ নিয়ে। পুনর্ভূ।

তারপর হলো, সেইসব নিয়ে এই গল্প।

তখন মার্চ মাস।

চারতলা অফিসের চেয়ারে বসে সকালের মেইল চেক করে একটা রিপ্লাই লিখছিলাম। হঠাৎ মোবাইলে একটা মেসেজ। চেয়ে দেখি অচেনা নাম্বার।

৯২র শেষ দিকে আমরা এই ব্যবসাটা শুরু করি। একটা সরকারি কন্ট্রাক্ট, পিসি সাপ্লাইয়ের। তখন দেশে নতুন এই যন্ত্রটা আমদানি হচ্ছে। কাজে লাগুক না লাগুক, অফিসে অফিসে, প্রোজেক্টে প্রোজেক্টে পিসি চাই-ই। পিসি মানে তো পিসি না। এয়ার কন্ডিশনার, টেবিল, চেয়ার, প্রিন্টার, কাগজ এমন কি কেউ কেউ কার্পেটও কিনছিলেন। এনজিওগুলি তখন ফুলেফেঁপে উঠছে। ডাট দেখাবার জন্য অফিস অটোমেশন খুব দরকার। তেমন কেউ যন্ত্রের ব্যবহার জানতো না। আরেকটা দিকও ছিল। সারাবছর বিরাট সাপোর্ট দিতে হত, প্রিন্টারের কালি, কাগজ। ফ্লপি ডিস্ক সরবরাহ।

৯৫তে বড় একটা কাজ শুরু হয়। ভোটার ডাটাবেজ ডিজিটাইজেসন। ছবিযুক্ত আইডি বানানো। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় একটা মানব ডাটা সংগ্রহ। অনেক মানুষ দরকার। অনেক মেশিনপত্র। ক্যামেরা। শহরের সব আইটি ফার্ম জড়িত হতে চাইছে। এরকম একটা সাপ্লাইয়ে সাবকন্ট্রাক্ট পাওয়া গেল।

একটা সাপ্লাই কন্ট্রাক্ট মানে অনেক কিছু।
বড় বড় কন্ট্রাক্টে জিনিসপত্রগুলি আসতে হত আমেরিকা বা এরকম বড় কান্ট্রি থেকে। কাগজপত্রে অবশ্য।

ফলে রমরমা বিজনেস। হংকং বা সিঙ্গাপুর থেকে জিনিস কিনে তা আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়া হত। সেখান থেকে কেউ একজন তা আবার ঢাকা পাঠানোর বন্দোবস্ত করতো। ইনভয়েস বাসানো হতো আমেরিকার নামে। সবকিছু মিলিয়ে কাগজপত্রের কাজ বেশি। বিরাট মার্জিন।
সমাজে প্রভূত সুনামও আসতো।

চমৎকার। প্রজাপতিগুলি উড়ছিল বিএনপি'র নতুন আমলে। দুতিনজন মন্ত্রী ছিল পরিচয়ে। তাদের কাজ খুব সহজ। পার্সেন্ট ধরা ছিল। শুধু একজন প্রাক্তন বামপন্থি'র স্বাক্ষাৎ প্রয়োজন, মাধ্যম হিসাবে।

মেয়েটার নাম রূপা। পুরুষটার নাম নাই। একদিন আমাদের দুজনের কথা হল, এলিয়েনের মত। দুজন তখন কেবল দুইটা কান। তখনো আমাদের কোন দেহ বা চেহারা নাই।

একটা পুরানো মোবাইল ফোনের মৃতদেহ রেখেছে ড্রয়ারে। এটার পেটের ভিতর সেইসব দিনের ডাটা রয়ে গেছে। কিন্তু তা আর উদ্ধার হবে কিনা জানা নাই। মেমরি চিপ ঠিকাছে হয়তো, ইনপুট আউটপুট ঠিক নাই।

সেই দুজি মোবাইলে শুধু টেক্সট ম্যাসেজ লেনদেন করা যায়।

ভাল।

কখনো কোনদিন ঘাড়টা শক্ত হয়ে ওঠে সেইসব দিনের কথা মনে হলে। মনে হয় চোখ স্থির হয়ে যাচ্ছে।

৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত হার্ডঅয়ার ব্যবসা পাচ্ছিলাম কম কম। তখন শুরু করলাম আইটি এডুকেশন ব্যবসা। বিভিন্ন রকম বিদেশী কোর্স এনে মানব সম্পদ বাড়ানো। দলে দলে। মুখরোচক বিপনন। স্বপ্ন বেচা। নানা রকম আইসিটি ডিপ্লোমা। কিন্তু আওয়ামিদের সাথে টেকা যাচ্ছিল না।

পরের ৫ বছরটাও ওঠা নামা চলল।

২০০৬ সাল থেকে খুব ব্যস্ততা যাচ্ছে। অনেকগুলি কাজ। বিদেশি সংস্থার বিভিন্ন মহলে পরিচয় বেড়েছে। তাই নানারকম কাজ আসে। মিডিয়াম্যানদের দৌরাত্ব কমেছে। কমিশন ব্যবস্থা আছে, তবে তা নিতান্তই ভদ্রভাবে।

।২।

অর্ধেকটায় দুই বন্ধুর অফিস। বাকিটুকু বাসা। পার্টনার ইদানিং চাকরি শুরু করেছে, তাই অফিসে আমাকেই থাকতে হয়। পার্টনার সন্ধ্যায় আসে। ওর কাজ করে রাতে চলে যায়। আমার ছেলে মেয়েও তখন অফিস ফেরত মাকে পায়।

দুপুরের আগেই হাতের কাজের চাপ কমে যায়। দুএকটা মেইলের জন্য অপেক্ষা, কিছু বৈকালিক ফিরতি ফোনের জন্য বসে থাকা।

+

'ডিম লাগবে নাকি, ডিম!'

ব্যগ্র, কিন্তু মিষ্টি স্বরে মেয়েটা নিবেদন করল। শীতের ব্যান্ড সংগীত!

সহসা মনে হৈল, দেশে কী জংগির অভাব পড়ছে, যে ওরা গরম ডিম ফেরি করে বেরাচ্ছে। ডিম দিয়ে র‍্যাবের জংগি জিজ্ঞাসাবাদ থেমে গেল নাকি দেশে?

তিরিশ বছর পরে হবে, জাহাঙ্গীরনগর আসছে। ক্যাম্পাসে ঢুকলেই সেই জিনিসগুলি আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দালানগুলি ছাড়া সেই আগের মত সহজতা। অনেক গুবলেট পাকানো নিয়ন্ত্রণ আর দারিদ্রের ভিতর দিয়া তাজা ছাত্র প্রাণগুলি সচ্ছল দুনিয়ার লালসা আর লালচের বাইরে বড় হচ্ছে, শক্ত হচ্ছে।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনি.র পথগুলা উল দিয়া বানানো। পাকাইয়া বলের মত গড়াইয়া চলে সূর্যোদয়ে। সূর্যাস্তে পাখিদের ডট আর বৃত্তচাপের সাথে উড়তে উড়তে আড্ডা বসে তারাদের। সবুজ মাঠের উপর।

*

অনেক দিন ধরেই কাজটা করে যাচ্ছে। ওদের কোন থামা নাই।

জয়েন্ট সেক্রেটারী বন্ধু দুপুরে ফোন দিয়া বলল: তিন সপ্তা বাসায় শুইয়া আছি। শরীর খারাপ। একটা হোয়াইট ওয়াইন রাখছিলাম, নিবা নাকি?

বললাম: তাইলে নয়ন ভাইরে বলি, সন্ধ্যায়।

না, না, না, না। আমি আর নাই। আর খাবো না। এইবার খুব কষ্ট করলাম। মনে হয় পান-জর্দা ছাড়ছি, সে জন্যই এমন!

ঠিক! নিকোটিনেরও তো উইথড্রয়াল আছে। আপনের এডিকশন বেড়া চলতেছে। ২১ দিনে ডিটক্স পূরা হৈছে। এইবার ঠিক হবে!

এখনো দিনের বেলায় মশারী খাটায়া রাখছে। একটা মাত্র দড়ি খোলা। পাশে টিপয়ে মুড়ির কৌটা, পিরিচে মুড়ি!

: ঠিকাছে সাদা ওয়াইন নিলাম, কিন্তু আপনের অর্কিড ভান্ডারে আজ হানা দিব কিন্তু!

এখন তো সময় না। ফেব্রুয়ারিতে। তাছাড়া সব দিয়া দিছি মেয়েদেরকে।

তাইতো। গত দুবছরে উনি দুটি মেয়েকেই পাত্রস্থ করেছেন। বাসার দুটি রুম অন্ধকার, ফার্নিচার বিহীন!

সরকারি টাকায় গাড়ি কিনছে! এখনো নতুনের মত! লিটারে ২০/২৫ কি.। কিশোরগন্জ যাইতে ৭০০ টাকায় হৈয়া যায়!

বাহ্ ভালইতো! সারা জীবন চালাইবেন!

কিন্তু ঢাকায় ফেরার সময় ১২ লিটারেও হয় না। এত জ্যাম। তাছাড়া ঢাকায় তো বাড়ি ফ্ল্যাট নাই, কিশোরগন্জেই থাকবো ঠিক করছি।

ঠিক বলছেন। সুনামি হৈলেও, ভূমিকম্প হৈলেও কিশোরগন্জ বাইচা যাবে। আমিও যাইতে চাই।

আর বছর দশেক পরে ঢাকা শহর যে একদা নিতান্তই এক মফ:স্বল শহর ছিল, তা বলার মত জীবিত মানুষ তেমন থাকবে না। ফলে শহরটা স্মৃতিচারিদের পারিবারিক শহর হিসাবে আর থাকবে না।

এই শহরের মজা শুরু হয় আশির দশকে সামরিক শাসনামলে। প্রাক আশি থেকে গর্ভযন্ত্রণা শুরু হৈছিল। স্বৈরশাসকের মধ্যগগনে এসে ঢাকা শহর তার নিজের চরিত্র পেতে শুরু করে।

মামুরা সব মতিঝিলে আসন নেয়া শুরু করে।

গার্মেন্টসের কোটা, ওভারইনভয়েসিং করে বেশি টাকা দেখানো, সেই টাকার নানা রকম টাল বাহানা করে আরো বেশি টাকা বানানো শুরু করলো সবাই। ভুয়া কোম্পানি বানিয়ে শেয়ার বাজারে ঢুকানো শুরু করল। এনজিওরা ধামাধামা উন্নয়ন কাজ শুরু করলো। পুরানো বামপন্থিদের ডেকে নিয়ে এসে বড় বড় পদায়ন করে কোটি কোটি টাকা ধরিয়ে দিল সামাজিক শিক্ষা দিতে।

বুঝছ, তোমার হবে!

শহরের রিহ্যাবে রিহ্যাবে ঘুইরা মাথার ভিতরটা আর খালি করতে পারলাম না। তবে একটা ডাইস বসাইতে পারলাম। কোনটুকু পর্যন্ত সীমা, সেই ডাইস। গুটির চাল কয় ঘর, সেই হিসাব।

।৩।

রিহ্যাবের দিনগুলি

এই দিনগুলি ছিলো ক্রমশ: নিস্তেজ হবার দিন, শরীর থেকে আশা ভঙ্গের মুহূর্তগুলি বসে বসে গুনতে থাকা আর দেহের ভিতরের মনকে জাগ্রত করার কায়দা চর্চা।

গাছের পাতা একদিন খুব উজ্জ্বল সবুজ আর গাঢ় মমতাময়ী মনে হল। ততদিনে যেন শরীর হারাইয়া গেছে। সাথী ভাইদের কাউকে কাউকে বন্ধু, কাউকে খালা, কাউকে নানী, কাউকে বড় বোন বলে ভ্রম হয়।

তখন একটা ছেলে মাথামুন্ডুহীন কবিতা লিখেছিল। আমার হুবহু মনে আছে:

সেফহাউসে ডিটক্স: সারডায় পাণিনির দশ রাত

লিচু পাতায় এখন কী বিকাল?
বখাটে বাদুর কার জন্য মাদুর গোছাচ্ছে বলো তো সম্বুদ্ধা?
জন্মের পর থেকেই নাদেখা মায়ের মুখ মনে পড়ে যায় কর্ণেলের বাচ্চাটার আর
সে কেন চায় শুধু চা। পানি পানি চা চায়।
লিচুপাতার জন্য ওর মনটা ও ও করে আর উ উ করে সে ফোঁপায়
যেদিকে দুচোখ যায় শুধু আধঢাকা লজ্জিত খাটে বিছানা
সার সার ঘুমের আরকে ভিজিয়ে রাখা দেহ
জানালা কম দরজাগুলি লাল।

চাবিগুলি কোথায় হে
লক্ষ লক্ষ জিঞ্জির বান্ধা

কারা লাগায় কারা তালাদের লাগায় লোহার দরজায়?
এখানে তো কর্নেল পুত্রদের বন্ধুরা নাই
তারা সুদুরে শিকারে গেছে বমি হাতে
নাক থেকে তাদের অঝোরে ঝরছে
গুচ্ছ গুচ্ছ চাবি

তালাগুলি ঝনঝন করে বাজে এতো বিছানায়া কারা
সহমরনে বমনে মৃত রমনে দিনগুলির ছানাপোনাদের ছড়া শোনায়?
তালাগুলি ঘুমায় না কেন? বিছানাগুলি পাখা পাখা করছে
হৃদয় মোচরাচ্ছে ফোমের গদী পাতা নাই, স্প্রীং কুটাচ্ছে
আরে বাপু শুয়ে পড়, মসুর ডাল বাগাড় দিচ্ছে পাশের বাড়িতে
তারাগুলি মৌমাছি অতিকায় মাঠে
পাহাড় উপত্যকা থেকে ফলের বাগান করতে হবে,
বনে ফুল ফোটাবার কাজ নিতে হবে
কিন্তু ফুলগুলি ফুটছে না এই হলো সমস্যা

নার্স বললো, আপনাদের এখনো পচিশটা টেবলেট খেতে বাকি তাই ওদের শরীর গুলাচ্ছে। সবাই শোনো এখন সিস্টার সবাইকে ছড়া শোনাবে সেখানে গণ প্রসার মাপা হচ্ছে বাকিরা বসো তোমাদের সবার হাতেই হিন্দি চ্যানেল পাবার জন্য রিমোট দেয়া হবে
ফুলের পাপড়িগুলি খাও আর খুঁজে দেখো
হিন্দি চাপ চাপ গান
ঢালাও মৃত্যুর গণবিছানা
যে যেদিকে পারে সেখানেই একটা করে বাথরুম

কোনটা বা লাগানো, কোনটা কেউ লাগাচ্ছে, কেউ বের হয়ে আসছে অথবা নিজে নিজেই বাইরে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শব্দ করছে
আর কেউবা খুব সক্রীয় ভাবে ৫ম বা ৯ম বার গোসল করার পর হিসাবে করে দেখছে বগলের নিচে তখনো তাপ পাওয়া যায় কিনা

কেউ বা শিশুন্যাংটা অনেকক্ষণ ধরে নুনু নাচানাচি করে
শাওয়ার ছাড়া বালতিতে বারবার মগ ব্যবহার করে ক্লান্ত
ছিটকিনি ঝুররঝুরর
কনফিউসড দিনগুলিতে
লাগানো দরজা খুলতেও ইচ্ছা করেনা
কোনো রকমে দেয়াল ধরে দাঁড়ানোর শক্তি দাও প্রভু
হে দোযখ হে বিহবলতা

হামাগুড়ি দিয়ে এবার একেবারে আবার হাটা শুরু করব শৈশবে মায়ের কোল থেকে নেমে।

[টীকা]

ডিটক্স: ড্রাগ ছাড়ানোর প্রাথমিক ধাপ। এই সময় শরীর থেকে ড্রাগের বিষ কাটানোর জন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যক্তিকে নিবিড় তত্বাবধানে রাখা হয়। ন্যুনতম সময় ১০ দিন।

কনফিউসড দিন: ডিটক্সকালীন শারিরীক অসাম্যাবস্থা। নানা রকম হ্যালুসিনেসন, অসম্ভব কল্পনা ও দেহের উপর স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণহীনতা দেখা যায়।

সারডা: একটি ডিটক্স সেন্টার। শুন্য দশকে সর্বপরিচিত।

গোছল: ডিটক্সকালীন সময়ে বারবার গোছল করতে হয়। শারীরিক যন্ত্রণা কমানো ও ঘুমের সামান্য সম্ভাবনা হয়।

[রিহ্যাব বাড়ি]

রিহ্যাবটা নিরিবিলি পাড়ায়। চারিদিকে রাস্তা, গাড়ী-ট্রাকের শব্দ শোনা যায়, দেখা যায়না। আসলে দুতলা বাড়িটার দ্বিতল পূরোটা বাশের ঝাজরির আড়াল দেয়া। বাইরের সাথে কোন ভিজুয়াল চলবে না। কয়েকটা জানালা আছে বলে কিছু দৃশ্য প্রত্যক্ষে আসে। তবে প্রেয়ার রুম বলে ছোট্ট একটা রুম, বাড়তি, আগে হয়তো ব্যক্তিগত আরাম কেদারা রুম ছিল এখন প্রার্থণার জন্য বরাদ্দ। এখানে কোরান-বেদ-বাইবেল-ত্রিপিটক-গীতা সহ এলকোহলিক এনোনিমাসের ড্রাগ ছাড়ার উদ্দীপনা জাগরুক পুস্তক রাখা আছে। যে কেউ একটা বই নিয়া দিব্যি সময় কাটায়া দিতে পারে। তখন মাথার উপর গাঙচিল এসে উড়ে যেতে দেখেছে ফজলু। প্রেয়ার রুমে ঘুমালে ৭গুন বেশি ঘুম হয়। কিন্তু সময় কম। কেউ কাউকেই থাকতে দেয় না। সবারই চোখ ঐ দিকে। ওখানে জানালা দিয়ে আম গাছটার বাকল দেখা যায়। বর্ষায় বৃষ্টির ছাদ আসে কোরান ভিজাতে। মধূসুদনের বীরাঙ্গনা কাব্য কে যেন দিয়েছিল, মাথানষ্ট হাফ বাঙালি ফ্রান্সিস তা সারাদিন সুর করে পড়ে। যদিও সে বানান না করে বাংলা পড়তে পারে না।

এই সময়ে কয়েকজন কবি আসে রিহ্যাবে। ওরা খুব বিপদজনক। খুব অস্থির কথা বলে। ওরা প্রেয়াররুমে বসে কিছু পড়ে না। শুধূ বই পড়ার ভান করে আর কাগজ চায়। কেউ ওদের কলম দেয় না। কলম দিয়ে কয়েক বছর আগে এক কবি সুইসাইডের চেষ্টা করেছিল। ওরা সবাইরে প্রকাশ্যে ড্রাগ খেতে মানা করত আর গোপনে সবাইকে ড্রাগের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য বর্ণনা দিত।

গড়াই নদীর পাড়ের ছেলে গোফরান গাঁজা খেত। তেমন কোন জটিল কিছু না। কিন্তু ও ছিল তার ছিড়া। প্রতিদিন মর্নিং মিনিটে একই কথা বলতো। 'আমি মোহাম্মদ গোফরান, গড়াই নদীর ছেলে। আমি প্রতিদিন দুপুরে গড়াই নদীর পাড়ে গাঁজা খেয়ে গড়াগড়ি করতাম। এখন আমি গাঁজা খাইনা।'

মর্নিং মিটিংএ সবাইকে কোন না কোন বাণী শোনাতে হত। দুচারটি বিশুদ্ধ বানীর পর শুরু হতো বানানো বাণী বিতরণ। এলিফ্যান্টরোডের এক্স ক্যাডার কাম ফটোগ্রাফার একদিন গাফফারকে শিখিয়ে দেয়: যতই করিবে কাজ, ততই লাগিবে লাজ। জ্ঞানের কথার শেষ নাই, জ্ঞানের চেষ্টা বৃথা তাই। গাফফার তাই অবুঝ মনে আওড়াতো।

সবাই গম্ভীর থাকতো এই সময়। সবাই খুক খুক করতো।

লম্বু রেজা নিজেকে বলতো ঈশাখাঁর বংশধর। হাটতো সিনা টান টান করে। কোন কাজ করতে চাইতো না। নিজের জমিদারগিরি ফলানোর তেমন কোন স্পেস নাই, আপন মনে বলে যেত: আমার বাড়ী সোনার গাঁ। বাংলার রাজধানী। ঈশাখাঁ আমার দাদার দাদার দাদা।

এসব কিছু নিয়ে রাতে লাইট নেবানোর আগে নাইট শেয়ারিং হতো। সারাদিন কে কি করেছে তার একটা হিসাব নেয়া আর কি। কিন্তু কিসের কি, শুধু হাসাহাসি। সারাদিন কে কারে কিভাবে বুদ্ধু বানাইছে তা মনে পড়া। বাঙালী বুদ্ধুরাম, কোন কিছুই সিরিয়াসলী নিতে পারে না।

সবার সাথে সবার ন্যুনতম বডিটাচ এড়ায়া কাছে থাকার নিয়ম। পদ্ধতিটা নিবিড় পারস্পরিক সাহচর্চ ধারণার বিপরীতে সাজানো। শরীর খারাপ লাগলে পরিচর্চা পাবার জন্য ভাল, কিন্তু মনটা বিষাদে আচ্ছন্ন থাকলে কেউ কাছে থাকলে অনুপ্রবেশ মনে হয়। তখন গায়ে যৌন টাচ দিতে পারে। তা থেকে দূরে রাখতে হবে।

সকালে উঠে সবাই মিলে হাতে হাতে রুটি বানিয়ে নাস্তা খাওয়া। জাইমি ভোরে উঠেই চুলা জ্বালায়া চা বানাইতো। এই সময়টা কেউ দেখে না যে কেউ বাড়তি কিছু চিনি-চা পাতা ব্যক্তিখাতে খরচ করতেছে কি না।

জাইমি ছিল এক প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের ভাইগ্না। সেই আশির দশকের শেষ থেকে ও বারবার ড্রাগ ধরে আর ছাড়ে। আর কারো সাথে দেখা হলে বলে: হোয়াটস আপ! ঢাকা শহরের সব রিহ্যাবে মনে হয় পরিচর্যা নিতে গেছে। এই জগতের সবার সাথে খুব দহরম মহরম। ছুটির দিনগুলিতে ওর বৌ বাসায় রান্না করা খাবার দিয়ে যেত সেন্টারে।

জাইমি এসে সবাইকে অভিজ্ঞতা শোনাতো আর ওর পরবর্তী ব্যবসার কথা বলতো। রিহ্যাব শেষে গুলশানে হোমমেড খাবার সাপ্লাই করবে, তার তোড়জোর করতো।

সকালের নাস্তাটা যেমনই হোক দুপুরের খাবারে মন ভরতো না কারো। রাজপুত্ররা টাইট সিডিউলে দিন পার করতো। কেউ কেউ সবটা খেতে না পারলেও সমান মাপের খাবার নিতে হতো। অবশ্য বাড়তি খাবারপার্টি আসে পাশেই থাকতো। এক ফাঁকে অতিরিক্ত আলুভর্তা, মাছের টুকরা বা সাদা ভাত তাদের প্লেটে চালান করে দেয়া হত। জাইমি ভাত খেতো কম।

সবার নানারকম গল্প ছিল। কয়েকজন বেশ ছোটগল্প রচনায় পারঙ্গম। তা নিয়ে সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাতো।

১। মেঘনা ব্রীজ থেকে লাফ

এক বিকালে গল্পটা বলে মইনুল। তার সাইকোসিস হয়েছে। চরম পর্যায়। একদিন রাতের ঘোরে চাটগাঁর বাসে চড়ে বসে আর নামে মেঘনা ১ম ব্রীজের আগে। সবার চোখ এড়িয়ে হেটে হেটে পৌঁছে যায় ব্রীজের মাঝ বরাবর। তখন মধ্যরাত। মধ্য মেঘনায় চাঁদনি রাতে রুপালি

চিকচিক সমৃদ্ধ নদীপৃষ্ঠ ওকে ডাকে। ও রেলিংএর উপর চড়ে বসে। দুদিকে হাত ছড়িয়ে দাঁড়ালে কোত্থেকে যেন অচেনা ভারসাম্য উড়ে আসে। পনের ফিট হবে এগিয়ে যায়, তারপর কে যেন ওকে বামদিকে হেলিয়ে দেয়। শূন্যে উড়ে উড়ে অনেকক্ষণ মহাশূন্যে ভেসে থাকার অনুভূতি।

কিন্তু পানির সাথে বুকের ভীষণ সংঘর্ষ হলে ওর জ্ঞান হারিয়ে যায়।

খুব মুখের কাছে সূর্যের ফুটে ওঠার আলো খোঁচা দিলে চেতনা ফিরে ওর। দেখে, একটা জেলে নৌকায় জালে পেচিয়ে জাল আলিঙ্গন করে শুয়ে আছে। উদাসীন জেলে দল ওকে নৌকা থেকে ফেলে দেবার বুদ্ধি করছিল। তখন ওর বাঁচার সাধ হয়। মনে পড়ে পকেটে অনেকগুলি টাকা আছে, সেগুলি দিয়ে জেলেদের সব মাছ কেনা যাবে। ও কাতরাতে কাতরাতে সেই প্রস্তাব দিতে এক জেলে বলে, সুইসাইড কেস নাকি! পুলিসে তো ধরব। তখন ওর চোখ দিয়া পানি পড়ে। ওর বাচ্চাটার কথা মনে হয়। লোকগুলা ওকে নিয়া হাসপাতালে যাইতে রাজি হয়। কোন রকমে হাসপাতাল গেটে ফেলে এসে পালায়। সেই হাসপাতালের ডাক্তাররা দেখে ওর ভিতর আত্মহত্যা প্রবনতা। তখন বুদ্ধি করে তারা ওকে পাঠায়ছে এই রিহ্যাবে।

২। ডোডো পাখির মত গোলালো তার মাথায় ডাবল ব্যাসের চুল।

একেবারে বাচ্চা। হঠাৎ দেখলে ওকে মনে হয় ফার্ষ্টইয়ার পড়া আজাদের মত। যেন আজাদ বা তার ভাতিজা। ওর দোষ চুরি করে সিগারেট খাওয়া। বাবার প্যাকেট থেকে চুরি করে মধ্যরাতে প্যাকেট

খালি করে ফ্যালে। এমন নিষ্পাপ চেহারা কিভাবে সি. খায় কে বলতে পারবে। ওতো নিজের চরিত্র ধুয়ে ফেলতে পারবে, কিন্তু এইযে ধারী বন্ধুদের কাছে নানান ড্রাগকার্য শিখে গেল, তা ভুলাবে কে?

৩। রকগায়কের ঝিনেদা থেকে আগমন

এক রাতে এক মেহমানের আগমন হলো মাথায় ব্যান্ডানা বাধা, লম্বা চুলের ফাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। এভাবে নাকি তাকে নিয়া আসছে ঝিনেদা থেকে। উনি ঝিনেদায় রক গান করেন।

এসেই বলেন আমারে স্পেশাল রুম দাও। মিউজিক সিস্টেম দাও। ভাল খাবার দাও। কিন্তু এসব তো এখানে কিছু নাই। রাতে সবাইকে লাইন ধরে বসে আজকে খেতে হবে শুধু আলু ভর্তা আর ডাইল দিয়া ভাত। রকগায়ক স্তম্ভিত হয়ে শুয়ে রইলেন। তাকে যা বলা হৈছিল সব তাহলে ভুয়া! তার মাথার ফ্যান্টাসির পোকা সরানোর জন্য সেসব তাইলে বাক্যসন্ত্রাস!

২য় বার রিহ্যাবে গেলে প্রথম দিন আর আগের মত হৈল না। আগের বার কোন মেডিসিন ছিল না। চিকিৎসা ছিল বারবার গোছল, আর হাত-পা-গা কামড়ালে টিপে দেয়া। হাত পা ম্যাসেজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক ম্যাসেজার কোন গা-টাচ না করে ম্যাসেজ দেয়। জানুয়ারির হাড্ডি কাপানো শীতে গোসল, যতক্ষণ পর্যন্ত না বগল ও কুচকির মতো দেহসন্ধিতেও কোন তাপ জমে থাকে।

জাইমি বলে : ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহটাতে আমি মরে যাই। আমার প্রভু এই পুরা সপ্তাহটা আমাকে মেরে মাটির নিচে পাঠিয়ে দেয়। আমার আর কিছু থাকে না।

এখানে ভীষণ ঠাণ্ডার রাত। যখন প্রথম বার আমার বিচ্ছেদ হল পরম ডোপামিন কন্যার সাথে। যার ডাক নাম ছিল নায়িকা চূর্ণ! প্রথম রাতে ভাবছিলাম মাইনাস ডিগ্রীতে উত্তরমেরুর সাদাসাদা সাপেদের মত গাদাগাদি করে লেগে আছি বরফের মাইনাসের সাথে, আমি একটা মাইনাস সাপ আমার আর কোন প্লাস বাকি নাই নাকি!

মাটির ভিতর খুব ঠাণ্ডা চাপে একটা ন্যানো ঘরে আলাদা করে রয়েছে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহটাতে! এখন বেশ কোল্ড। আমার কোল্ড জীবনটা খুব একার। তাইতো এই সময় ন্যানো ঘরে কাটাই। কোল্ডের সাথে কাউকে নিতে চাই না। সমাজ রাষ্ট্র এমনকি পরিবার ও না!

শুন্য আকাশ হলুদ পাতা অপার কুয়াশা

চুপচুপে দিন
গামলার পানিতে
আমারে ওয়াটারবোর্ডিং করে
ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহটা!
কাশির সাথে উঠে আসে বুক থেকে
ব্যাপক বেদনা
চেয়ে দেখি
যাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না,
তাদের মুখ কুয়াশা থেকে
একটু একটু করে দেখা যায় কিনা।

রিহ্যাবে আসার দিন থেকে সব প্রকার ড্রাগ থেকে বিচ্ছেদ ঘটাতে হয়। সেকি বেদনা নিজেকে বস্তু থেকে প্রত্যাহার করার দিনগুলি।

এই সময় যে কষ্ট শুরু হয় তার অনেকটাই শারীরিক, আর বাকিটা মনোজাগতিক। এই সময়টার ডাক নাম 'ব্যারা' ওঠা। শরীরের অবৈধ বিষ ম্যানেজ করা খুব টাফ।

২য় বার ব্যবস্থা পরিবর্তন হয়েছে। এবার দেখল প্রথম রাতেই একটা পাগলা টেবলেট খাওয়াল। উইথড্রয়াল ব্যারা কাটাবে। পরপর তিন দিন মাথার ভিতরে নিম্নলিখিত কাহিনী ঘটে গেল। বলা বাহুল্য তাতে প্রবল আলো, শব্দ ঝংকার, ভয়, শক্তিস্রোত এবং শেষদিন একটা প্রবল অন্ধকার নি:সঙ্গতা গ্রাস করে নিল।

ক. বিহারি পীরের দরগা, তুর্কি নাচ ও গর্ভদান

প্রথম ব্যারার রাতে হাত পায়ের খিঁচুনিগুলি কোথায় হারাইয়া গেল, শূধু মাথার ভিতরে খিচখিচ। প্রচণ্ড কোলাহল, দ্রুমদ্রিম ঢোলের বাদ্য, জরির চিলকানি। তাকিয়ে দেখি কোন এক বিহারি পীরের মজমা। কে জানি নিয়া গেল আমাকে খানকা শরীফে। তার এক আত্মীয়ার বাচ্চা হয় না, পীরের মরতবায় আজ তা হতে যাচ্ছে। পড়া ডিমেও কাজ হয় নাই। আজ মধুপূর্নিমায় বিশেষ কাওয়ালি আছে, আলো নিভানো চর্চা আছে। আমি আসছি সেই বিশেষ কাণ্ড দেখতে।

কাওয়ালি শুরু হলে নির্মেদ শরীরের কয়েকটা যুবক এসে তুর্কি নাচ শুরু করলো। ঝনঝন করে কাশর বাজালো কেউ। হাতে কাঠের তরবারী, যেন মোহরমের হায় হোসেন হায় হাসান। জড়োসড়ো বধুটিরে সেই তুর্কি নাচের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। কাওয়ালির এক একটা ঢেউ ওঠে, আর সেই যুবক দল নৌকা বাওয়ার ছলে আর রামছাগলের দক্ষতায় ঘুরণ ধরে আর চেষ্টা করে নারীটিকে ছোঁওয়ার। ঘরের মধ্যে কাম আলো জ্বলে নেবে, কে যেন ঘন ধুমাবগলানো ধুপদানি রেখে যায়। ঘরের আলোতে কালো রং ভুরভুর করছে। জন্মদানের কামালো ভয় আর বিস্ময় অভিভূত বধুটির উপর ঘনিভূত হতে থাকে।

শব্দের নাচানি এমন হয়ে ওঠে মেয়েটা একবার কান্দে একবার হাসতে শুরু করে পাগলীনির মত। মা হবার অবরুদ্ধ কামনা তার দেহ থেকে জ্বলে ওঠে। একটা পাতিলের ভিতর যেন খিচুরী পাকাবার উদ্দেশ্যে আহামরি করে। একটা উন্মত্ত খুনতি উনুনের উপর উপগত হয় না কেন? মহিলাটা কানের পর্দায় শব্দের আহাজারি উন্মত্ত হয়।

হুজুরের এক সেবক এক গ্লাস রক্তিম জুস এনে তার সামনে ধরে আর বলে: খান খান। আপনার ভিতর যৌবন আসুক। আর পান মাত্রই শরীর তার কেমন খাবি খাইতে থাকে। সামান্য নারী থেকে শে তৈরি হতে থাকে স্বর্গবেশ্যায়। তার মনে হতে থাকে শে আজকে জয় করেই ফিরবে। এমন অধ্যবসায় তার শরীরে কিলবিল করে ওঠে। শে সেই পাক খাওয়া যুবক দলের মাঝখানে কেন্দ্রে বিবি হয়ে কামনায় থরথর করে কাঁপছে।

একটা যুবক কিশোর ঠিকই বিদ্ধ করতে পারে ঝিকিমিকি মধ্যবয়েসি মাতৃকামিনী মাননীয়াকে। তার দীর্ঘলিঙ্গ এই কাজে বিশেষ পারদর্শী। সে দাঁড়িয়ে থেকেই উপগত করতে পারে নারীকে। সে পলকেই নারীকে উর্ধাকাশে তুলে নিতে পারে। সে চুম্বনহীন সংগম করতে পারে। তার আলিঙ্গনে নারীর চোখ লাল আভা ধারণ করে।

এইভাবে শুধু আরেকটা নারীর জন্ম দিতে পারে সে। তবু সেই যুবক বার বার জিজ্ঞেস করে: কি চান আপনি? ছেলে না মেয়ে? আমি শুধু মেয়ের জন্ম দিতে পারি। যেন সম্মতি খুব দরকার। যেন সে একটা মাতৃকামী নারীর মনের ভিতরটা বদলাইয়া দিতে চায়। যেন সব নারীই আরেকটা নারী জন্ম দিতে চায়।

হঠাৎ দ্রাদ্রাদ্বিদ্বি দিদিম দিদিম... শব্দে আর আলোকচ্ছটায় শিউরে উঠে সকলে। ব্যারায় আমার শুন্য মাথা ছটফট করে ওঠে, ভিতরে রগ টাস টাস করে টান টান করে কিলবিল করে ওঠে। নাচতে থাকে তুর্কি নাচ। ঘুরে ঘুরে, কাঠের তরোয়াল হিসহিস করে। মাথার ভিত্রে ইলালালা উলালালা ধ্বনি।

খ. হাইড পার্কে রক মিউজিক

২য় দিন গেল অর্ধমরার মত অবসন্ন। সন্ধ্যায় আরেক ডোজ পাগলের টেবলেট দিল। এই রাত আরো সঙ্গীত।

ঠিক চেনা না গেলেও একটা পার্কে কন্সার্ট হচ্ছে। ঢুকে মনে হল, এটা লন্ডন হাইড পার্ক। জীবনেও হাইড পার্ক যায় নাই, কিন্তু কিভাবে যেন চলে এসেছে এই ভার্চুয়াল মিউজিক ফেষ্ট এ। চারিদিকে অসংখ্য অপটিক ফাইবারের তার। তারগুলি স্বচ্ছ। বাইরে থেকে দেখা যায় ডাটা বয়ে যাচ্ছে। ইলেকট্রনের প্রবাহরাশি আরেক প্রবাহের সাথে মিলমিশ খেয়ে জড়াজড়ি খেয়ে তৈরি করেছ হরেক রকম আলোক ঢেউ। নানান রকম থিমে বদলে যাচ্ছে রং আর রঙের জ্যামিতি। ওয়েভের ইন্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে, একটা ওয়েভ এসে আরেকটাকে পিসে ফেলছে মশলাপেসার যন্ত্রে। মন্ত্র নাই অথচ মন্ত্রোচ্চারন হচ্ছে। ছন্দ নাই অথচ জটিল আপ ডাউন হচ্ছে রঙের। শরীর থেকে শরীরের দিকে ফোটন ছিটকে এসে মনটাকে দেহময় মাটির লেপাপোছা মসৃন করে দিচ্ছে।

সব মন সংযোগে। এই ভাবলো ক্যারিবিয়ান সূর্যাস্ত, তো চোখের সামনে আকাশ ভরে গেল মহাসাগরীয় সূর্যাস্ত। ভাবলো সুন্দরবনের হোগলা বন তো বাজতে শুরু করলো বিলায়েত খাঁর সেতার। ভাবলো আলাস্কা তো ভরে গেল তুষার শুভ্র জ্যোতিদেশ। জানাপানা ঝাকানাকা। মেটাল আর জ্যাজ, ব্লুজ আর মঙ্গোলিয়ান সব একাকার। একটা ভাটিয়ালি সুর বাজছে স্যাক্সোফোনে। পেটের ভিতর মনের গুরগুরি। পেট পুরেদ্দে তুয়ার লাই।

মেঘের ভিতর থেকে নরকের প্রাসাদ দেখা যায়। রংয়ের ঘাটতি নাই। আকাশ ভরা নরক রং। নরকের দরজায় লেখা: ভরসা রাখো নরকে, হাত পাতো নরকের কাছে। সাত পর্দার আঘাত থেকে আলো ছুটে আসুক।

হাইডপার্কে ঢুকে আর বেরোনোর পথ পাচ্ছে না। লণ্ডনের টানেলের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। টেমস নদী পার হবার সময় একজন বললো

: মাথার উপর নদী। অমনে নদীর কলস্বরে ভরে গেল মাথা। পানির কলকল সুর একটোনে ধেয়ে গেল অসীমের দিকে।

হে অসীম কোথায় তোমার হাউস? তুমি কোন সুদূরে বসে মাল খাচ্ছ? আলোর তিল্লীতে ফাপরের পাণ্বিতে গালাচ্ছ হেরোয়িন। মাথার ভিতর তৃষ্ণা।

নগরের রূপের ঝিল্লিতে হাইড পার্ক রকের ছন্দে দুলতে আছে। অনন্ত মেথডে বাণীহীন সঙ্গীতে পথ হারায়া গেল। ওর আত্মা ভরা কান্না। শুকনা হাইড পার্ক ওকে দাবড়াচ্ছে সুরের ঝাপটে। মাথার ভিতর হাইড এণ্ড সীক। কাছে আসে আর দূরে যায়। সকল একান্ত আবহাওয়া গরমে ফেলে দিয়ে আবার শীতলতর করে দ্যায়।

ওরে ডাকতেছে সুর না রঙ বুঝতে পারে না।

এককোনায় গরিবি হালতে কবিতা পাঠ হতেছে হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে বীটের তালে তালে। গলার রগ ওদের ফুলে উঠতেছে কিন্তু কিছুই শোনা যাচ্ছে না। চিকনদাড়ি একজন চিনচিন করতেছে। কিন্তু বিয়ার খেয়ে টাল এক হোতকা কবি প্যান্টের বেল্ট টেনে তুলতেছে। শ্রোতারা শুয়ে বসে মত্ত হয়ে কান পেতে আছে। কেউ কেউ ঘুমাচ্ছে কিন্তু পা নাড়াচ্ছে। বসেপড়ে সেই খোলা আকাশের নিচে, তারের ভিতরে। মাথার উপর দিয়ে গলগল করে যাচ্ছে ডাটা। বিলিয়ন বিলিয়ন মেগা বাইট অসম্ভব সমীকরণ বহু গিগা গতিতে বয়ে যাচ্ছে।

গ. গন্ধকের পথে যাত্রা, নিজের পা খুলে তিল্লি বানায়ে মাল খাওয়া

তৃতীয় সন্ধ্যায় শেষ ডোজ। এর বেশি আর দেয়া যাবে না। শরীর আজ চরম ভাবে নিস্তেজ। হাড়ে হাড়ে অবসাদ। গত দুরাতের চরম উত্তেজনাখেচনে অতি উত্তেজনা থিতিয়ে পড়েছে। দেহে বল নাই, নুনু একেবারে বল্টুর মাথার আকার ধারন করছে।

পাগলা টেবলেট ল্যান্ড করলো খুব গরিবি বাড়িতে। ‘বাড়িতো নয় ভেন্না পাতার ছানি।’ মাটিতে ল্যাপ্টানো, তাপ তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। দেহ চায় বস্তু। সে বস্তু পৃথিবীতে নাই। নিষ্ফল বাতাসে উড়ে বেড়ায় আশাহীনতা।

ফুসফুস, গলা সব শূন্য। ভিতর থেকে শ্বাস নেবার প্ররোচনা যেন নাই। যা দম নিতেছে সব অটোমেটিক। ডায়াফ্রাম নাই।

মনে কয় একফোঁটা মাল পাইলে বাইচা যাইচাম। পড়ে আছি রাস্তায়, গড়াচ্ছি। রাস্তাটা পাহাড়ে উপরের দিকে ওঠার। গড়াতে গড়াতে উঠছি। পা নাই যেন। উব্বুত কান্ধে ভর দিয়া বাইচা রইছি। এক ফোঁটা আগুন দেখা যায় আগ্নেয়গিরির মাথায়। গন্ধক গড়িয়ে নামছে, দলা দলা গলা লাভা না যেন ব্রাউন সুগার, কালো কালো, হলুদ হলুদ। মাল গড়ায়ে আসে তিল্লি কই, তিল্লি কই। আগুন কই? দপ করে একটা হলকা ওঠে, পাশে খাদ। ভয় ডর নাই এখন তিল্লি জ্বালাতে চায়। তিল্লি কই, একটা পায়ের নলী ছিড়ে আগুনে ঝুলিয়ে দেয়। ঐ তো মাংশ একটুকরা ত্যানার মত জ্বলছে, চর্বি গলে গলে পুড়ছে। দুই হাত কাছে নিয়ে জোরে এক টান। ফুসফুস নাই... তলাহীন টানে পিনিক আসে না।

গরিব পাহাড়ে পড়ে থাকি আমার কোন সঙ্গী নাই। দুনিয়ার সৃষ্টি হৈছিল কোন জাহান্নামের পেট থাইকা? ওরে ফ্যালাইলো কে বাছাধনের বাবা! কে ওরে কৈছিল এই পথে যাইতে। এই না পথে শ্যাম আর যাবনা যাবনা আর যাবনা।

আবার মনে হয় মরা বুড়িগঙ্গার ময়লা পানিতে ভাসছে। শহর থেকে নেমে আসা কলকারখানার লিটার লিটার ভারী বস্তু পানিতে মিশে আছে। সেখানে গনকটুলি সুইপার কলোনির দেশি মদের গাদ মেশা গন্ধ। কলোনির স্মৃতি মনে হতেই মনে পড়লো বাসেতের সাথে ওর মৃত্যু হবার আগের শেষ দিনগুলির কথা। তিন হাত উঁচা করে একটা ডেরা বাঁধছে রাস্তার গা ঘেঁষে। রিকসা গেলে তাতে বাতাসের ঝাপট এসে লাগে। সেখানে মোস্তফা সহ তিনজনে গাদাগাদি করে আড্ডা মারতাম। তখন কে

জানতো বাসেত কয়দিন পরেই মরে যাবে। বাসেতের পেশা ছিল গেরস্ত বাড়িতে চুরি। চুরি করতে গেলেই ওর খিদা পাইতো। বাড়িতে ঢুকে খুঁজতো খাবার আছে কিনা। পাইলেই গপাগপ খাইতো। চুরি করার পর জিনিসপাতি নিয়া আজিমপুর গোরস্তানের নির্জন কোন কবরে হান্দাইয়া রাখতো। কদিন পর উত্তেজনা কমার পর সেগুলি বাইর কইরা বেঁচতো। টেকনিকটা বহুদিন চালাইছিল। চুরির টাকা পাইলেই মাল খাইতে বসতো।

মনে হচ্ছে বাসেতের সেই কবর ঝুপরিতে হাটু ভেঙে বসে মাল খাইতেছে। বুক ভরা ধুয়া। বাসেত বলতেছে: দম ছাইড়েন না খিচ মাইরা বইয়া থাকেন। অনেক দামি ধূমা। আজ সেই ধুমা কৈ। চরাচর ধরে বিষন্ন দিন। কিছু অন্ধকার কিছু আলো।

একটা বিশাল চামচ ভরা পাঁচশ গ্রাম মাল চাই। বাসেতরে নিয়া সারাদিন গুলতানি মারব আর ঝালাই দিব। নেশায় চুরি করার জন্য ঠান্ডা মাথা চাই। মিহিচূর্ণ গলে গলে আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা হয়ে ভরে দিক তৃষ্ণা। জীবন থেকে চুরি করে সুষমা নিয়া আসুক।

পরপর তিনদিন আমার মনোভ্রমণ হলো তুমুল। তারপর এক মহাজাগতিক বমি উঠে আসে পেট থেকে। নালী বেয়ে উর্ধমুখী একটা দমক গলা বেয়ে তুমুল স্রোতে মুখ দিয়ে ওয়াক করে বের হয়ে যায়। তারপর বারবার সারাদিন চলতে থাকে। ধিকি ধিকি বমি। বুকজ্বলা তিতা।

।8।

পোষ্ট ব্যারা যৌন ইউফরিয়া

ড্রাগ থেকে বিরত হবার পর দিনগুলি ছিল শুন্যতায় ভরা। এই সময় যা কিছু ঘটে তা যেন দূরের বাতাসে ভেসে যাওয়া গান। প্রাণ আনচান করে কিন্তু তাতে তবলার বোল পাওয়া যায় না। অপরূপ বিপরিত লিঙ্গের জন্য প্রবল অস্থিরতার পূর্বাভাষ ঘোষনা হয়ে যেতে থাকে যেন। দুনিয়া দুই ভাগ হয়ে ছিল। যে ডোপামিন মাথায় কাজ করতো, তা ছিল ড্রাগের। আজ আবার যেন তা স্বাভাবিক কামজ্বরে মেতে উঠতে চায়। হে প্রভু, ফিরিয়ে দাও মোরে সকল কামনা।

এই সময় তুমি এলে।

২০০৯ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা। ফোনের জন্য অপেক্ষাকাল শুরু!

ধরো গল্পটা এমন যে, ঐদিন আসলে ওরা যা করছিল সেটাই ঘটছে। সবাই যা জানে তা ভুল।

গুলির শব্দের ভিতর দিয়া তুমি বাসা থেকে বের হলে। আমিও বাচ্চাদের আনতে স্কুলে যাব। রিকসা পাইতে পাইতে আবাহনি মাঠ। সেখানে কুল কেনা। তারপর তোমারে রাপাপ্লাজা পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া স্কুলে যাব।

এমন উত্তেজনাপূর্ন ভয়ংকর আনন্দের বসন্ত আর আসে নাই।

তুমি এমন করতেছ কেন? বাইরে এত গুলির শব্দ কেন? ফেব্রুয়ারি মাসে গুলি হওয়া মানায় না।

হ্যাঁ, কোন কিছু মানায় না। শুধু এখন ঘরে শুইয়া থাকা মানায়। বানায় নিতে নিতে তোমাকে সাজানো থেইকা অসাজনে নিতে হয়। বলে ওর গাল থেকে একটু মাখন মাখন তেল তেলে আদর নিজের গালে মেখে নেই।

জানো, আজকে সকাল কেমন ঝকঝক করে উঠছে। আজকে ক্যান বৃষ্টি হৈল না। মেঘলা দিন, গুরগুর করে আকাশ কামড়াবে...

এমন সময় বিডিআর হেড কোয়ার্টারের দিক থেকে সত্যি সত্যি গুলির বৃষ্টি হতে থাকল। দেখ কারা যেন বাজি ফুটাইতেছে, এই সকাল বেলা তুমি যে আমার কাছে আজ আসছো, ওরা শুনছে। বল কি, ওদের সাথে তোমার যোগ আছে নাকি।
কার, বাজিঅলাদের?

[ভবিষ্যতে রূপার নাম হবে দার্শনিক এমোনিয়া]

আমি দ্বিমুখী চরিত্রের অধিকারী।

আমার কেরিয়ার সিভি দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে কিভাবে একটা বাইপোলার প্রবনতা খুবই স্পষ্ট। পরীক্ষা করে প্রমাণ বের করে নাই, কিন্তু আশেপাশের সবার চোখমুখ দেখলেই বুঝতে পারি। চাকরির দিকে না যাওয়া, ব্যবসায় মনোনিবেশ করা। কিছু না করা। এসবই আমার বাইপোলার গন্তব্য।

মেয়েরাও বলেছে একথা। 'আপনি তো বহুগামি, থাকবেন না'। 'আপনি ফুলে ফুলে মধু খাওয়া ভ্রমর' এক সঙ্গীত প্রতিভা বলেছিল।
'আপনে হৃদয়বিহীন প্রেমিক। খুব বিভ্রান্তিকর।'
'আপনি নারীবিদ্বেষি' একজন একথা ছড়াইছিল সমাজে!
'তুমি ব্রুট! পাশবিক। তোমার মনটা খুব নোংরা' যে এই কথা বলেছিল, তার অতীত আমি বের করে সাজাইয়া দেখাইছিলাম তারে।

তুমি জানো নারে প্রিয়

তুমি মোর জীবনের সাধনা
তোমায় প্রথম যেদিন দেখেছি
মনে আপন মেনেছি
তুমি বন্ধু আমার বেদন বুঝো না।

।৫।

ষষ্ঠবারের মতো তুমি এমআর করার জন্য টেবিলে শুলে মেরী স্টোপস এর বয়স্ক নার্স অবাক হয়ে বলেছিল: আপনার হাজব্যান্ড কি বিদেশে থাকেন? সব কিছু ঠিক আছে, যেন ব্যবহার করেন না। তখনও তার হাতে গ্লাভস পরা। শ্যামলা হাসিহাসি মুখে উৎসাহব্যঞ্জক অভিব্যক্তি।

: এখনকার দিনে এই রকম দেখা যায় না। দুই বাচ্চার মা! বলেন কি, সব কিছু যে সেরকমই আছে।

‘কি সব, কেমন এসব’ খুলে না বললেও ব্যাপারটা হাসি হাসি মুখে শুনলো। কিন্তু বারবার এরকম হলে বিরক্তিকর। মূল্যবান সময়গুলি এভাবে নষ্ট হচ্ছে, মন মানে না।

সেই চিরন্তন হাসি। শুরু হয় ঠোঁটের বাঁকা ভঙ্গির থেকে। আস্তে আস্তে ফাঁক দিয়ে তাতে সূর্যোদয় ঘটে। স্মৃতির মতো গালে নরম। একপাশে একটু বেশি টোল। বাম চোখ আরেকটা চোখ থেকে কম হেসে ওঠে। হাসিটা পূরা হয়, যখন তার ভেতর আকিকা মুসারা হয়ে জায়গা করে নেয় মৃত্যু ও শুন্যতা। ব্যস্ত হিসাবে কি করার আছে। বেশি দিতে হবে নাকি কম খেতে হবে? জোছনা রাতে সালমান খানের সাথে নাচে কখন যাবে? খুব সেজেগুঁজে বৃষ্টির মধ্যে? সারারাত বা খুব ভোরবেলা?

ঘাড়ের উপর বহুদিন ধরেই একটা মাথা ছিল। একদিন চুল কাটার সময় নাপিতের ক্ষুরের টানে তার সেই ছোটমাথাটার মাথা কেটে যায় আর সেখানে আস্তে আস্তে আরেকটা ছোট মাথা গজায়। একদিন চিন্তা করা শুরু করে সেই মাথা। তারপর ওর শরীরের কিছু অংশের দখল ও নেয়। বেশকিছু ঝগড়াঝাঁটি হবার পর একটা সমঝোতা হয়। দিনরাত ভাগাভাগি করে চলে।

'হোয়াট আর ইয়ু ডুয়িং রিসাইক্লিং সিচুয়েসন এন্ড দ্য সিচুয়েসন'।

লেখক এর সাথে নাপিতের মিল আছে। খুব বেশি শারীরিক কাজ করতে হয়না। কিন্তু বেশ সমাদর, কাটে না কাটে রক্তপাত হয়না।

ধন্য ধন্য বলি তারে, বেঁধেছি এমনও ঘর মৌনতা এজন্যেই সব কথা বলা হয় নাই।

আকাশে লাল লাল চর্বির আভা। মেঘ সায়ান রংয়ের সাথে। ওরা কিছুটা দায়ী। তারপর এলোমেলো চেয়ে দেখে কে কিভাবে দেখছে। তখন কিছুটা আলো নামল। রবিবাবুর প্রাক্তন তালগাছ একটা উল্টানো ফানেলের মতো চাল থেকে একপায়ে দাঁড়ালো।
মৌনতা, এজন্যেই সব কথা বলা হয় নাই।

ও আয়নায় নিজেকে দেখতে গিয়ে তাই অন্য কিছুই দেখে ফেলে।
বইপড়া মানে নানারকম ডাটা সংগ্রহ। পরিমাণটা কয়েক রকমের। চেতনা রস ভেতর দিয়ে শুরু করে। আগের চেয়ে এই চেতনার উন্নতি হয়েছে।

জিন মিউটেশন কিভাবে হয়? শুধুই নফসের দ্বারা? ভালোবাসা স্নেহ সন্তানের ভেতরে ঢুকে যায় কি ভাবে? কোন মিউটেশনে?
সময় বর্তুলাকার। একথা বলতেই বেশ ব্লক অনুভূত হয়। বেহুদা কথার পিঠে কথা, যুক্তির পিঠে পাল্টা যুক্তি। মাঝে মাঝে তার তো একটু মিথ্যা বলতে হয়, তা নইলে রহস্য থাকেনা।

রূপা সাত বছর বয়স থেকেই বুকে পিঠে হাত খেয়ে আসছে। কাজের ছেলে, মামা, চাচা, পুরুষ এমন কেউ নাই যে ওরে হাতাতে চায় নাই। তাই এখন প্রতিশোধ নিচ্ছে করে করে। পুরুষের সব সম্পর্ক যন্ত্রণায় ফেলে শেষ করতেছে। মনে হয় বার বার করে যাবে। পুরুষ জাতিকে ছারখার করে দেবে।

নতুন ব্রেকাপের পর

রূপা বারবার পড়ে আর তারপর ব্রেকাপ হয় আর কাঁদতে বসে।

কথাটা হল তুমি আবার কেন পরাজিত হইলা? পরপর বারবার। তোমার সময় শেষ।
: হ্যাঁ এবার খুব বেশি কাতর হয়ে গেছি। কোনভাবেই পারছিনা।
তুমি তোমার একটা আবিষ্কার তাইতো একটা চেয়ার নিয়ে মেতে উঠেছ।
: ওরে কালকে বাসায় আসতে বলেছি।
ছি ছি ছি ছি কি বলো? দুদিন পর তোমার কাঁধে সওয়ার হবে এটা।
: পারিনা যে কিছু মনে থাকে না।
ছি ছি ছি ছি ।
: তোমার কথায়ই তো আমার মনে জেদ উঠেছে। তুমিই বলেছিলে যাও বাসায় আনো...
: বল কি আমার কথায় তোমার এমন করতে ইচ্ছা হল?
হ্যাঁ তুমি এমন সব কথা বলোনা খুব রহস্যময় মনে হয়। তখন মনে হয়, সেটাই সত্য।
: আসলে তুমি কি করতেছো বলতো? আমার কথায় এত চলো কেন?
হা হা হা, তুমি যে আমার গুরু।

গলার ভেতর একটা ঢোক আটকাইয়া থাকে। আবার একইসাথে একটা দূরতর আশা খেলা করতে থাকে আমার মনে। যদি আবার শে ফিরে আসে!

: আচ্ছা যাও তোমাকে আর চাই না
নিরুত্তর
: না না পারবো না, একটুকুও পারবোনা।
তুমি যে পাগল হয়ে গেছ।
: আচ্ছা আর হবে না তোমার সাথে আমার? আগের বারের মত নিজের চৌদ্দ আনা না পাই তাও মন ভরবে। পুরাটা চাই না।
তাইলে আছো।
: তবে তুমি আর যাবা না, ঠিক ঠিক?

আমি কেন যাব, তুমি থাকবে আমার। আমি তোমার আছি। থাকবো। দেখো। আমি যেখানে থাকি আমার মত থাকি।
: আমার কাছে না হয় আমার মত থাকবে।
সম্ভব না।
: সম্ভব করতে হবে, তোমাকে আমার চাই চাই চাই।
যাও ঘুমাও, যাও ঘুমাও
: তুমি একটা খাঙ্কি!
কি বললে তুমি জানো কথাটার অর্থ?
: তুমি একটা নোংরা এনিম্যাল আমার কাছে। আমার মনে বেঁচে থাকবা। এভাবেই বেঁচে থাকবা।
কি বললা?
: গালি দিলাম, অর্থ জানিনা।
যাও ঘুমাও। তুমি ছিলে আছো থাকবে, কোন চিন্তা করার নাই। এখন শান্ত হয়ে ঘুমাও। ঘুমাতে যাও।

তাই ঘুমাতে গেলাম আমি। আমার ঘুমে কোন ওষুধ লাগে না।

জানো আমার দুধগুলো বড় হইয়া যাইতেছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বুঝি সাইজ বাড়ে? ৩৪ থেকে ৩৬ হয়?
: তোমার ভালবাসা এখন গলে মমতা হইয়া ফুলে যাইতেছে।
ভালো তো। অনেক মমতা এখন আমার!
: তোমার মমতা এখন ছোট ছেলেদের দিকে!
ও কত ছোট, আমার ছেলের মতই লাগে।

: ওরে মমতাদি! ছি ছি লজ্জা করে না?
ও চোখ বন্ধ করে সেই লজ্জার স্বাদ উপভোগ করে যেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।
বলে, তাইতো। জীবনে তো কম ভালোবাসা দিলাম না। কি পাইলাম?
: হৈছ এক সাদা বিড়ালের চাচি।

কথা বলতে বলতে ফোনটা অন রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃদু মৃদু শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাস্তার শব্দ কমে গেছে। সুনসান নীরবতার মধ্যে তার নাকের স্বরধ্বনি মৃদু থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠছে। এদিকে আমি চেয়ারে চিত হয়ে আধশুয়ে স্তব্ধ হয়ে আছি। নাড়াচাড়া করার শক্তি নাই। পাথরের মত দেখতে লাগছে নিজেকে। নিজের মনকে সেজন্য তালা মেরে রেখেছি। তার নাসিকা গর্জন হচ্ছে। শে যেন গভীর ঘুমের মধ্যে চলে যাচ্ছে আর কথা বলার জন্য রয়ে গেছে নাক। সেই শব্দে ওজন। ও নাক ডাকার ভিতর দিয়েও কথা বলে যাচ্ছে। কত যে কথা তার ঘরঘর করে বলে যাচ্ছে শে। পাহাড় ধ্বসের কথা, হাওড়ে হঠাৎ বন্যার কথা। ৩০ কিমি. যানজটের কথা। নিজের একান্ত স্বপ্নগুলি ফেলে, দেশের দূর্দশা

চিত্রগুলি তার ভিতর দুঃস্বপ্ন ছড়িয়ে নাক ডেকে ভেতর থেকে দম নিতেছে।

তুমি তোমার স্বপ্নের কোথায় এখন?

আমার স্বপ্নভঙ্গ হৈছে। ৫ মিনিটে একটা শব্দ। অদ্ভুত খুব চ্যাপ্টা করে বাতাসকে পাতলা করে। শ্বাস ছাড়া কিছু শোনা যাচ্ছিল না। একটা মাঠের ছবি চোখের পেছনে ঘুরতে লাগলো: ‘স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, স্বপ্নভঙ্গ হইছে’ বলে ‘হইছে’ শব্দটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ভেতর দিয়ে গেল। ভঙ্গ হয়, সেটাই যেন আমার গ্লোবাল শ্লোগান। তোমার মুখ থেকে আসার প্রতীক্ষায় ছিল। তোমার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে তাই আমি খুশি। এইবার আবার তোমারে স্বপ্ন বুঝাইবার সম্ভাবনা তৈরি হৈল।

।৬।

আজ থেকে থেকেই মনটা ভালো লাগছে। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যাবার পর এমন লাগেনি। সারা সকাল দুপুর একা রান্নাঘরে কাজকর্ম করার সময় ব্যাপারটা বোঝা যায় নাই। হঠাৎ কি যে হল, বিকাল না হতেই ফুরফুরে লাগছে আজ। খুব করে সাজবে। বাইরে যেতে মন চাচ্ছিল। আবার একটা শূন্যতা ঘিরে ধরে, যেন ভিতরে মনের মুখ মুখ চেপে ধরেছে একটা হাত। জোর করে রেখেছে কোথাও যেতে দিবেনা।

সাজতে বসলো শে। নিজে সাজগোজের ট্রেনিং করছে, তবু একলা আয়নার সামনে বসলে বুঝতে পারেনা কি দিয়ে শুরু করা উচিত। তবে আজ একদম সাদাসিধা শাড়ি পরবে। কাঁদবে, ঘুমাবে, ফোলাফোলা মুখ একটু ব্রাইট করবে। মায়াবী লাল টিপ, হাতে কাপড় প্যাঁচানো বালা, গলায় পাটনা বিহার। সেজেগুঁজে নিজেকে বলবে এই, কেমন আছো। একদম তার গলায় বলবে। তার ভঙ্গিতে বলবে। যেন সে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে না জানিয়ে অপেক্ষা করছিল কখন শেষ হয়। তারপর এসে বলছে: কেমন আছো!

তুমি বলবা: একদম চমকাইয়া দিছ, বাব্বাহ!

না কারো জন্য ও সাজেনা। নিজের জন্য এত কিছু! নিজেকে অপরূপা মোহনীয় করার জন্যই মনটা টানছে। নিজেই নিজের প্রসঙ্গে প্রশংসা করবে। সে তো সবসময়ই করে আসছে সেই ছোটবেলা থেকে। নিজেকে দেখে আসছে ও একটা পুরুষের চোখে। নিজেকে ভেবেছে পুরুষের মন দিয়ে। আর তাইতো সহজেই অভিযোগগুলিকে বুঝতে পারে। পুরুষ ভাষাগুলির ইশারা-ইঙ্গিত টের পায় সবার আগে।

মাথার ভেতর উল্টাপাল্টা ডাকছে কারা যেন। অনেকদিন আগের কিছু মানুষের গলার স্বর শোনা যায় প্রায়। নিশ্চুপ দাদি যেন জোরে জোরে কথা বলছে কিন্তু দুর্বোধ্য সেইসব কথাবার্তা।

হঠাৎ দেখে দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। মৃদুভাষী দাদি একটা অসম্ভব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন। সারাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে আসছে। কারো হাতে খাবার, কারো হাতে কাপড়চোপড়! কি না, উনি উনার সব আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজখবর করছেন। ভিতরে ভিতরে তাহলে এই কাজ চলছিল! কত অজানা অচেনা মুখ যে আসছে। কত বিচিত্র তাদের চলাফেরা। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ চাকুরে, কেউ দালালি। চাঁদপুর থেকে, সৈয়দপুর থেকে, ফরিদপুর থেকে, চট্টগ্রামের রিয়াজউদ্দিন বাজার থেকে। মারিশ্যা থেকে রাঙ্গামাটি থেকে কোথায় এতো ভাবের স্বজনেরা যে ছিলো এতদিন!

কোথায় নাই তাদের স্বজনেরা! একদিকে তার বাবার কুল, একদিকে শ্বশুরকুল, আরেকদিকে ছেলেমেয়েদের কুল। কেমন জটিল জালের মত জড়াইয়া আছে জোড়া জোড়া মানুষের ইতিহাস। অক্ষরগুলি হইতেছে বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে। এক একটা ইট। প্রতিটা ইটের সাথে আরবী টাইপ। এইভাবে একটা মৌচাক! মৌমাছির মত মানুষ উড়ে উড়ে চলে না, দলবেঁধে চলে। না, কোথায় সৈয়দপুরে বসে এক জোড়া মা-বাবা ইট তাদের ছেলেমেয়েকে ওখানকার মাটির সাথে শিকড়-বাকড় গেড়ে দিছে। যে একটা চেহারা পেয়েছে তার সাথে ঠাটারী বাজারের আদম ব্যবসা করা ইটটার কোন যোগাযোগ না থাকলেও দেখা যাচ্ছে ওরা প্রায় একই প্যাটার্নের সংসার করেছে বা করে নাই।

জন্মতারিখ তিনটা

এসএসসিতে একটা, দ্বিতীয় বিয়েতে একটা, পাসপোর্টে একটা। ডাকনাম দুইটা। জীবনের ব্যাপ্তি খুব বড় না হলেও খুব ছোট না। ওর কোন স্মৃতি ধরে রাখা নাই পিছু ফেরা নাই পুরনো জিনিস সংগ্রহে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একদম ফিটফাট হয়ে বসেছিল আয়নাটার সামনে যেন কোথাও যাবে। যেন অপেক্ষা করছে একটা সিএনজি নিয়ে এলেই বের হয়ে যেতে পারে।

আয়নায় তাকিয়ে দেখতে পায় সামনে বসে আছে ওর প্রতিরোধ। দেখে দেখে আর সাধ মেটেনা। চোখদুটা একটু ছোট ছোট হলে কি হবে তা এত নির্মল দৃষ্টি ধরে আছে যে, কেউ এর সীমা খুঁজে পাবেনা। ভাষাহীন অথচ নাকথাবলা ও তাকিয়ে থাকে। তারপর স্থির হয়ে কল্পনায় ভাসতে থাকে নিজের করে রাখা একটা ছোট্ট নদীতে।

জিনিসটা হাতে পেয়ে কিছুটা চমকে যায়। যদিও নরম তুলতুলে, বেশ বাহারি, ওজন প্রায় নাই বললেই চলে। ও তাকিয়ে থাকে কিন্তু চোখ দুটো যেন সামনে না দেখে পিছনের দিকে দেখতে থাকে। মাথার ভিতরের দিকে খুশিতে থাকে, এর মধ্যে কি কোনো ইশারা রয়েছে?

যদিও এসব ঘটেছিল ১০ বছর হয়ে গেল। ওর জামাইর ওমরা করে সৌদি থেকে আনা সেই বোরখাটা এখনো অব্যবহৃত! ভাজ হয়ে পড়ে আছে। সমকালীন কাপড়-চোপড়ের ফাঁকে আড়ালে লুকিয়ে। আজ একটা বিশেষ জায়গায় যাবে বলে কালো রংয়ের জামা খুঁজতে গিয়ে হাতে সেটা উঠে আসে। বের করে মেলে ধরে পায়ের উপর। মাথাটা ঝুঁকিয়ে ভাবতে থাকে, এটা কি ওর দেবতা ওকে সত্যি সত্যি পড়াতে চেয়েছিল?

নাকি সবাই যেমন ওমরায় গেলে ধর্মীয় চিহ্নযুক্ত কিছু একটা আনে প্রিয়জনদের জন্য, সেইভাবে এনেছিল? নাকি সে সত্যি সত্যি চেয়েছিল ও এটা পড়ুক। নিজের চলাচলকে সীমিত করুক!

যদিও হাসি পাবারই কথা আজ। শে যাচ্ছে বিশেষ একজনের সাথে দেখা করতে। মেয়ের স্কুলে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে যাচ্ছিল, হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত! দেখা করবে তার সাথে। গত তিনমাসে ফোনে ফোনে যার সাথে কথা বলেছে প্রায় প্রতিদিন!

লোকটা রাজি হয়ে যায়। যদিও এতদিন সে চায়নি দেখা হোক। অনুষ্ঠানে বসে রীতিমতো ঘামছিল। আশ্চর্য এমন হয় কেন। ভাবে, ঠিক আছে, সে আসুক না, দেখা করবে না। কিন্তু একটা দুর্নিবার টান তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আনন্দ বেকারীর দরজা দিয়ে ঢোকার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আরেক দরজা দিয়ে শে ঢোকে। যদিও ঢুকে দ্রুত খুজছিল, কে সে? সবাইকে দেখছিল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, কাউকে সে মনে হয় নাই। দরজা দিয়ে ঢুকে কিছুটা বিমূঢ় হয়ে একটা লোক তাকাচ্ছিল যখন, তখনই বুঝতে পারলো, এই লোকটাই। লোকটা একটা ঢিলেঢালা কাঁচাপাকা, ওর থেকে ইঞ্চি দুয়েক বড়। এরকম একটা লোককে ফোনের কণ্ঠস্বর কল্পনা করা মোটেও সম্ভব না। একটা মুহূর্তের জন্য ও নিজেকে হতাশ আর ব্যর্থ ভাবল!

কি কখন আসছো?

এইতো বাচ্চাদের জন্য খাবার নিচ্ছি। একটু দাঁড়াও!

দুজনের মধ্যে অপরিচয়ের পর্দাটা যেন নাই। দুজনেই যে পাকা অভিনেতা। কি করা কি করা বলতে বলতে একটা ছোট কফির দোকানে ঢুকলো। পৃথিবীর জঘন্যতম লাচ্ছির অর্ডার দিয়ে টেবিলে মুখোমুখি বসে

ভাবল, লোকটা কোন দিকে তাকিয়ে আছে বুঝা তো যাচ্ছে না। সানগ্লাশে চোখগুলি দেখা যাচ্ছেনা। কি দেখছে সে ওর দিকে?

হায়রে এই লোকটার সাথে গত তিনমাসে এমন কোন বিষয় নাই যা নিয়ে কথা বলে নাই? মুখে কিছুই আটকায় না যে লোকের সে এমন চুপচাপ অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। অথচ ফোন নম্বরের একটা সংখ্যা ওলট-পালট হওয়ার জন্য তার সাথে পরিচয়। আর এমনই ঘোড়েল, পরদিনই ফোনে কথা বলেই ওর শরীরটা দেখে নিয়েছিল। তার এমনি সম্মোহনী সরাসরি সহজ আবেদন, শে সাড়া না দিয়ে পারেনি। আর আজ এখন হুতুম পেঁচার মত এভাবে বসে আছে!

যদিও জায়গাটা তেমন স্বস্তিকর নয়, যেকোনো সময় চেনা মানুষদের সাথে দেখা হয়ে হতে পারে। তবু পৃথিবীর জঘন্যতম লাচ্ছি মুখে দিতে দিতে বুঝা গেল ওরা সহজ হতে শুরু করেছে। দু-একটা ফানি কথাবার্তাও হচ্ছে। আর এভাবেই ২০ মিনিট শেষ। এটুকু সময়ই বরাদ্দ করেছিল ওরা, পরস্পরকে!

মোটকথা প্রথম সাক্ষাৎকার একটা যাচ্ছেতাই ভাবে হল। বিচ্ছিন্ন হবার মিনিট দশেক পরে বার্তা পেল: তুমি তো আমাকে পছন্দ কর নাই মনে হচ্ছে। দেখা না হলেই ভালো ছিল।

পরে শে স্বীকার করেছে: হ্যাঁ তুমি আমার কল্পনার মানুষটার মত নও! কিন্তু তোমাকে দেখার পরে মনে হয়েছে তোমার সাথে আমার হবে!

আজ সন্ধ্যায় রূপার ওই চেহারা আমি ভুলতে পারবনা। বাগানের গাছগুলো ভুতুড়ে আর পরিচয়হীন হয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে দূরে একাত্ম সাদা বাতি। মাথার উপর আধা চাঁদ। আমরা বসেছিলাম চন্দ্রিমা লেকের পানির কাছ ঘেঁষে বসার দেয়ালের উপর। পাশাপাশি বসেছি। পেছনে পানি সামনে বাগান বা বাগানের ছায়া।

হঠাৎ বাঁদিকে মাথা ঘুরিয়ে, তোমার দিকে তাকিয়ে, জিজ্ঞাসা করি: ওর নাম কি? তুমি অন্যমনস্ক ছিলে। প্রথমটায় কিছু বুঝলে না। যেন বললে চমস্কি! কি? ও বলল: কার নাম কি? কে কোথায় থাকে? তারপর যেন চমকে উঠলে। একটা হালকা সচেতনতা তোমার অন্যমনস্কতাকে মুছে দিল। বললে: না তো, তাকে ভাবছিনা। তোমাকে বলব কেন? আমি একগাল হাসি দিয়ে বললাম: ঠিক আছে। ওকে তো ভাবছ, তোমার মুখ বলে দিচ্ছে কিরকম ভাবছো।

শে কথা বলেনা। প্রগাঢ় হয়ে পানির উপর থেকে ছিটকে আসা কাঁপাকাঁপা আলোর রহস্য দেখে। তারপর আমার মুখের দিকে কতক্ষণ অপলক তাকিয়ে থেকে বলে: কাউকে ভালোবাসি না। জেদ থেকে লেগে থাকি। হয়তো ১৩ দিন কেউ আমার কোন ফোন ধরে না। তা আমারে পাগল করে ফেলে। তারপর দুদিন হয় কিছুটা সামলে ওঠার জন্য আবার ফোন করি। তারপর তাকে ভুলে যাই।

আমাদের আশেপাশে ওর বাচ্চা দুটি খেলছিল। ছোটটা তার আলোজ্বলা জুতা পড়ে দৌড়াচ্ছে। বড়টা আধো-অন্ধকারে টিসু পেপারের ওপর পেন্সিল দিয়ে কবিতা লিখছে। বললো, আমি লিখি আর মুছি। কোনো লাইনই লেখার পর ভাল লাগে না।

তোমাকে হারিয়ে দিছে? আমি অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি। আমার ভিতরটা খা খা করতে থাকে।
হ্যাঁ, একরকম হারিয়ে দিয়েছে বলতে পারো। তবে আমিও ছাড়বো না। ছয় মাস হোক, এক বছর হোক, দেখব।

কেন, কি দেখবে?

আমার ফোন ধরে নাই কেন? কি হয়েছে? আগেও ধরত না। চ্যালেঞ্জ ছিল আমার। মেয়ে মানুষের সাথে কথা বলে না, এ কেমন পুরুষ। একবার তো বলেছে। ১৫ দিন একটানা কথা বলছি। কিন্তু তারপর আর ফোন ধরে না কেন? কি হলো তার, আমার জানতে হবে।

ও, এইজন্যই আমার সাথে ১০ মিনিটের বেশি সময় হতো না তোমার? বলতে, ব্যস্ত! সবসময় একরকম যায় বুঝি? এইতো তাহলে ঘটনা!

হ্যাঁ ওটা সত্য!

আমার দিকে টান তাহলে কমে গেছে?

না তো কমে নাই। তবে ওই সময় টান ছিল না। আমি তো মিথ্যা বলি না।

বাহ ভালই তো! আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। দেখি ওর ব্যথিত মুখে তখনো কষ্টের চিহ্ন পড়ে আছে। পরাজয়ের। প্রতিশোধ স্পৃহা খানিকটা কমে এসেছে বটে, তবে চোখের নিচে কালো দাগ। এমন সুন্দর মুখশ্রীতে অনিদ্রা এভাবে কামড় দিতে পারে!

আজ বিকালে ফোনে ওর শক্ত কথায় কেঁদেছে। এখন তার কোনো চিহ্ন নাই। খুব অস্থির আর বেপরোয়া মনে হচ্ছে।

সোয়া আটটায় বাগানের প্রহরীরা বাশি দিয়ে জানালো সময় শেষ, উঠতে হবে। উঠতে ইচ্ছা করছিল না। মনে হচ্ছিল, আরো কিছুক্ষণ বসে কথা বলি। হোক না অন্য পুরুষকে নিয়ে।

ওরা উঠল। ওর ছেলে মেয়ে দুটি আগে-পিছে যাচ্ছে। ওরা দুজন মাঝখানে। গাছের ছায়ার পথটুকু কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল, আলোতে এসে একেবারে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। শে কিন্তু বেপরোয়া হয়ে হাটছে। অন্যসময়ও ফিরে যাবার সময় এরকম করে। যেন ওকে প্রকাশ্যে চেনেইনা।

হাঁটাপথে নানান ভদ্রলোক, কলগার্ল ও গৃহবধূরা আছিল। একটা মিশ্র পরিবেশ। কে যে কাকে কি বলছে স্পষ্ট বুঝা যায় না। কয়েকবার এঁকেবেঁকে গেল। দুইজন পুরুষকে পাশ কাটাল। হঠাৎ জোরে শুনিয়ে শে

বলে ওঠে: শালার ব্যাটা বলে কিনা কল গার্ল? আরে বেটা তোরা তো ওই ধান্দায় এখানে আসছিস। বেশ্যার ভাতার।

আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই ওর মেজাজের উষ্ণতা দেখে। পাব্লিক প্লেসে বিরাট জ্বালাধরাণো প্রতিবাদ।

নাহ, একেবারে বারোটা বেজে গেছে এই সমাজের।

আমার ঘরের দরজা-জানালা চেয়ার-টেবিল সোফা বিছানা-বালিশ সবাই তোমাকে দেখতে চায়। তোমার স্পর্শ চায়।

।৭।

রূপার বিউটি পার্লার

ব্যস্ত হতে সময় লাগলো না। শিশু পুত্রকে ভালো স্কুলে দেবার জন্য কোচিং এ দৌড়াদৌড়ি শুরু হলো। কাছাকাছি নামকরা শিশু কেন্দ্র হল 'মেধা সিঁড়ি'। সপ্তাহে চারদিন বিকালে। যাওয়া আসা ৩৫মিনিটের। তাই ওখানে অপেক্ষা করাটাই শ্রেয়।

ক'দিনের মধ্যে কয়েকজনের সাথে মিলে বন্ধু দল হয়ে গেল। মানে ওর প্রভাব দিয়ে আর ঢং দিয়ে আর দেহবল্লরীর গান শুনিয়ে বিস্মিত করে ফেললো ভাবি ও আপাদের। ফলে ব্যস্ততা ও সংগ ভাগ হতে লাগলো। আমাদের সেই দুপুর বিকাল বেলার আলাপ কমে গেল।

তুমি কিছু একটা কর।
কি করব? এমএ টা দিব নাকি? ফর্ম ফিলাপ করি তাহলে।
হ্যাঁ করো না কেন। করে ফেলো। কখন কোন কাজে লাগে।

একদিন তিতুমীর কলেজে ফরম ফিলাপ করে এলো। কাছেই এক ভাবি ছিল, শেও দিতে চায়। দুজনে ভাগাভাগি করে সিএনজি ভাড়া দিল। একটা ছেলেকেও পাওয়া গেল, বন্ধু সহায়তা দিবে। সাজেশন ইত্যাদি। বলল, আপু আপনারা এত কষ্ট করে বাচ্চাকাচ্চা রেখে পরীক্ষা দিতে আসছেন, আর এইটুকু করতে পারবোনা? জোর করে টাকা দিয়ে এলো। ও ফটোকপি করে দোকানে রেখে যাবে। ফোন করে জেনে নেবে কবে আসতে হবে।

এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখে, ইসলামের ইতিহাসে বিশাল বিশাল উত্তর। পড়তে গিয়ে মুখস্ত হতে চায় না। শেষ করে তো প্রথম অংশ ভুলে যায়। এটার সাথে ওইটা যোগ হয়ে যায়। সন-

তারিখ মনে থাকে তো নাম মনে থাকেনা। এইসব দোলাচল। একবার সাহস হয় তো, আরেকবার হয়না। নিজে পড়তে গেলে ছেলের ভালো স্কুলে পড়ার কোচিং ঠিক থাকেনা।

শেষপর্যন্ত এমএ প্রথম পর্ব পরীক্ষা দেয়া হলো না। তবে ঠিক করল বিউটি পার্লার দিবে। কয়েক বছর আগে শেয়ারে একবার দিয়েছিল। যদিও সেখানে পার্টনার ফাঁকি দিছিল। মহল্লার রাস্তায় পার্লারটা হল। রীতিমত নীল রঙের আসবাবপত্র, পর্দা দিয়ে সাজালো। নাম দেয়া হলো: রূপা'স পার্লার। সাইনবক্সে নীল করে লেখা। যদিও ঠিকমত জায়গা পাওয়া গেল না। পাশের কোচিং সেন্টার সব দখল করে আছে। মিলাদ পড়িয়ে শুরু হল। একটা গারো মেয়ে আরেকটা টাঙ্গাইলের মেয়ে কাজ করবে। যদিও এখানে গারোদের বলে চাকমা মেয়ে। চাকমাইয়া।

প্রথম সপ্তাহে দু-একজন করে কাস্টমার আসছিলো। ভ্রু প্লাক জাতীয় হালকা কাজ। দু-জন ফেসিয়াল করে গেল কিন্তু তারপর মনে হচ্ছিল কে যেন বাধা দিচ্ছে। বাঁধা পড়েছে অন্য দিকেও। বাড়িওয়ালা সাইনবোর্ড নিয়ে কথা বলল। পাশের কোচিংসেন্টার ঝামেলা শুরু করলো। বলে কোচিং সেন্টারের পাশে বিউটি পার্লার মানায় না। কে যেন কলিংবেলের ব্যাটারি খুলে নিয়ে গেল।

বড় মেয়েটা বলল: আপা মনে হয় কেউ কবচ করেছে। পার্লারের সর্বত্র ও চোখ বুলিয়ে দেখল কোথাও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় কিনা। বাইরের এক চিলতে বারান্দায় টব ছিল, ওখানে কিছু শুকনা পাতার দলা পাকিয়ে। ও তুলে নিল। বাসায় নিয়ে গিয়ে চুলায় পোড়াতে হবে।

মামাকে ফোন করে বলল এর একটা বিহিত করতে। উনি খুব কামেল মানুষ। অনেক কিছু জানে। একবার কারা যেন ওদের বাসায় কাক চালান করেছিল। কোত্থেকে না জানি বড় বড় কাক দলবেঁধে এসে ওদের

বাসায় হামলা করত। কাচের জানালা ঠুকরে ঠুকরে ভেঙে দিত। কা কা শব্দে অতিষ্ঠ করে তুলতো প্রতিদিন। মামা তখন কি একটা তাবিজ দিয়েছিল। সেই যে কাকগুলি গেল, আর আসে নাই।

কদিন পর বিকালবেলা বড় মেয়েটা কাচুমাচু করে বললো, আপু আপ্নারে না জানাইয়া একটা কাজ কইরা ফালাইছি। শুনলে আপনি কি যে মনে করেন। ও জিজ্ঞাসু চোখে তাকালে বলল: কুদৃষ্টি কাটাইতে সারা ঘরে পেশাব ছিটাইছি। ও হতবাক হয়ে গেল, বলে কি মেয়েটা! বলে, হ্যা আপু, এটা খুব কার্যকর। আমি আগেও করছি। ও জিগায়: পেশাব পাইলা কই? মেয়েটা মাথা নিচু করে লাজুক হাসিতে বলে: নিজেই! যাও বাসায় গিয়া কাপড় বদলাও। আর সকালে আইসা অবশ্যই ভেজা কাপড় দিয়ে সবখানে ভাল কইরা মুছবা। যেখানে যেখানে লাগছে সবখানে। মেয়েটা চলে গেলে ও বলে খবিশ! ওয়াক থু! ও যেখানে জায়নামাজ এনে রেখেছে, নামাজ পড়েছে। আর সেখানে কিনা! কি ঘেন্নার কথা!

বাসায় গিয়ে মনে হল, মেয়েটার পেশাব চিকিৎসা কি কাজে লাগবে? এটাতে যদি ব্যবসার জন্য কাজ হয়? তারপরেই মামার ফোন আসে। সাড়ে সাত হাজার টাকা লাগবে। একটা দামি গাছের শিকড় লাগবে, তার জন্য। এমন দাম? অবশ্যই কাজ হবে। একটা গোপন সাংকেতিক জায়গায় রাখতে হবে। আশ্চর্য ওই দিন সকালেই একজন কল করলো। ফেসিয়াল+ পেডিকিউর+হেয়ার ট্রিটমেন্ট শিখতে চায়। একসাথে করালে কত লাগবে? ও বললো, আসো, সমস্যা হবে না। পরদিন মেয়েটা এলো। হাতে কলমে ট্রেনিং নিবে। ১০০০০/- এ ঠিক হল। অর্ধেক অগ্রিম দিল।

কিন্তু পরের দিন এক কাষ্টমার এসে প্রায় চার ঘন্টা কাজ করায়ে বলল: ভুলে পার্স আনি নাই। আমি এলাকার মেয়ে, বাসা থেকে টাকা নিয়া আসতেছি। তারপর সেই যে গেল, আর আসে নাই। ফলে গচ্চা গেল

৪০০০/-। এখন নতুন শিক্ষার্থী মেয়েটাকে প্রায় বিনা খরচে শিখানো লাগবে হিসাবে। লাভ নাই।

মাস দুয়েক টেনে টুনে চলল। তৃতীয় মাস থেকে মাইনাসে পড়ল। বাড়ি ভাড়াই ওঠে না। যে কাজ আসে তা চাকমাইয়া মেয়েটাকে দিতেই শেষ হয়ে যায়। টাঙ্গাইলের মেয়েটার জন্য কিছু থাকে না। ২ লাখ টাকার ফার্নিচার, রং করার খরচ, নিজের শ্রম সব বৃথা গেল। বাড়িঅলার চাপ ছিল, কোচিং সেন্টার কোন মতেই পার্লার চায় না। ফলে ৫ মাসের মাথায় সাইন বোর্ড নামাইতে হৈল। ফেরৎ আনা নীল রংয়ের সোফা বাসায় গাদাগাদি করে রাখতে হৈল।

শান্ত হয়ে এবার একটু থাম তো।

আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাও? আমি শান্ত হবোনা। যতদিন এই রূপ আছে, আমি করে যাবো। এটাই আমার নেশা।

নেশার তুমি কি জানো? নেশা মানে জীবনের জন্য উচ্চ আসক্তি। তোমার তো নাকি আসক্তি নাই। আমি আসক্ত না, তবে আমাতে আসক্ত হয়ে যায় দেখি। আর তাতেই আমি আসক্ত। আমি আমার নিজে তে আক্রান্ত।

নমুনা শুনি।

যেমন তুমি।

আমি যে আসক্ত তার প্রমান?

এইযে আমি তো বলেছি তুমি যতদিন চাইবে ততদিন আমি আছি

তুমি না চাইলে?

তার আগে তুমি চাইবে না আমাকে। এমন অবস্থা করবো যাতে তুমি না চাও।

শে মধুর খসখসে রহস্যময় তাকানোর মতো হাসে। যে চলে যায় তার কথা আমার মনেই থাকেনা।

আমি বলি: আমার উল্টা। যে আসে সে আমার ভবিষ্যতের মধ্যে আটকে যায়। সে অতীত হয়না।

শে বলে: দেখো, নদীর পাড়ের গ্রামের মেয়ে আমি। জেলা শহরে জন্ম। কিন্তু গ্রামের পথঘাট চিনি। গ্রামের গন্ধের জন্য মনটা এখনো হাহা করে। আমি ছিলাম ছেলেদের দলের সর্দার। আমার সাথে লাফানো ছাপানো কেউ পারত না। ঝুঁকে-পড়া গাছ থেকে লাফ দিয়ে নদীতে পড়েছি। চরের কাশ বনের ভেতর দিয়ে সরু পায়ে হাঁটা পথে দৌড়াইছি। এইতো এইসব করতে করতে কত কিছু ছুঁয়ে এলাম।

তোমার আশেপাশের মেয়েরা কি তোমার মত কেউ ছিল? ধরো তোমার বোন?

আরে না, আমি সবসময়ই আলাদা। তবে ছোটবেলা থেকেই আমাকে মানুষ ভুল বুঝেছে। আর সেই ভুল বোঝা থেকে আমিও হয়ে উঠেছি একরোখা জেদী।

নইলে ক্লাস এইটে পড়ার সময় বাসায় দেরি করে ফেরার জন্য মা এমন করে বলল: বেরো, বের হ। ভাগ! আর জীবনটাও একমুহূর্তেই বাঁক নিয়ে অন্যপথে কেন চলে গেল।

সেকি?

এই মুহূর্তে শে সামনে থাকলে আমি পলক না ফেলে স্থির চোখগুলি বড় বড় করে ওর দিকে তাকাতে থাকতাম।

মার বকা শুনে আমি পাথর হয়ে গেছিলাম। যখন বললেন, তুই এই বাড়ি থেকে চলে যা, আর আসিস না। আমার দেহের ভেতর এমন এক বজ্রপাত হল যে, আমি তখনই বাসা থেকে বের হয়ে এলাম। এক স্যান্ডেল, একই কাপড়ে। তারপর আর ফিরি নাই। এখন যাই, তবে বেড়াতে। দু'চারদিনের জন্য। কিন্তু মাঝখানে বিশাল বড় মোটাসোটা এক অজগর হয়ে গেছে আমার জীবন। সেই বাসাটা আর চিনিনা।

অজগর, সব গিলে খাও নাকি?
কেন জানোনা আমি যে সাপ?

তোমারে নগ্ন হতে আমি দেখেছি। হতে পারে তোমার শরীরে একটা সাপ আছে। তবে তুমি সাপ না - এই বলে আমার ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি। ওর বুঝি মনে পড়ে যায় সেদিন ওর নগ্ন দেহ নিয়ে আবিষ্কারের আনন্দে মেতেছিলাম। সেখানে এই কথাগুলি বলেছিলাম।

এমন তো নয় যে এ নতুন কিছু আলাদা কিছু। কিন্তু এ যে এক নতুন একজনের সাথে। অন্য একজনের একটা সংবেদনশীল দেহে স্পর্শ। যার সর্বত্র পরিবেশিত হয়ে আছে জাগিয়ে তোলার চুমুক রস। এইসব ভাবছিলাম। বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলাম আর মগ্ন ছিলাম। হঠাৎ জানুসন্ধির সেতু এলাকায় এসে মনে হলো একটা ফণাতোলা সাপের কথা। এইমাত্র যেন ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে ছোবল মারতে উদ্যত মুখটা হা করেছে। খুলবে বলে একটামাত্র মুহূর্ত বাকি! ছবিটা টেরা পিক্সেলে তোলা হয়ে রইল। ওর কথা বলার মুডটা কেটে কুঁচকে গেল। অনেকদিন পর মুখের ভেতর জিভটাকে দ্রুত টুইস্ট করে ‘ক্ল্যাপ’ শব্দটা করলো। ছেলেরা ছোটবেলায় যেভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে।

তুমি না একটা বদ। সবসময় বদমাইশের চিন্তা।

গান গাইবা নাকি? চলো গাই। কিছুদিন আগেও ওরা মাঝে মাঝে ফোনে খেলত। দুজনেই জানত ওটা অভিনয়, তবু নিজে নিজে মজা পেত। একদিন বুঝল অভিনয় না, আসলে আসলটাই। তখন অবশ্য ওদের দেখা হয় নাই। পুরোটাই ছিল কল্পনা। ওর ছিল ব্যাপক শিৎকার প্রতিভা। আমিতো নাম দিয়েছিলাম: উচ্চাঙ্গসংগীত। এমনভাবে গাইত, বুঝাই যেত না শে এখন ফোনের ওপারে রয়েছে। টেনে টেনে, হিক্কা হেচকি তুলে,

গগণবিদারি কন্ঠে হাইপীচে গেয়ে যেত ক্রমাগত। কোন স্ল্যাং নাই সেখানে, শুধুই 'ওস্তাদী' প্রলাপ ধ্বনি। নানান রসে নানান রাগে।

যেমন একদিন: কিগো গাইবানা?
কে না করছে। তবে মন ভাল নাই।
ঠিক আছে তাহলে রুহ সংগীত হোক!

চুপ করে গোটা কয়েক শব্দ করলো। মনে হতো চুমুর শব্দ। আসলে কি রাবার ঘষার কিনা কে জানে? পুরোটাই তো ছিল বানানো আর অবিশ্বাস দিয়ে ভরা। তবে ওকে দেখেই বুঝেছিল নিজেকে হাইড করে না। মানে যেসব বিষয় নিয়ে মানুষ লুকুচুরি করে। পরিচয়, সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক বিষয়ে, পরিবার ইত্যাদি বিষয়ে ওর কোন গোপন নেই যেন। শুধু চলমান যেসব বিষয় ঘটনাকে প্রভাবিত করে, তা গোপনে খুবি পারঙ্গম। হয়তো এইটুকুই গোপনে লস নাই।

তো কি এমন হয়েছিল যে, মায়ের বকা খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে। আর তোমার জীবনের গতি বেঁকে গেলো।

যাবেনা? যদি নাইনে পড়ুয়া একটা মেয়েকে বাসা থেকে বের করে দেয় আর তিনদিনের মাথায় সেই অবস্থায় তার বিয়ে বসতে হয়? বাসা থেকে বের হয়ে উঠলাম এক বান্ধবীর বাসায়। ওরা আদরে আশ্রয় দিল। বাসার কাছেই ওদের বাসা। তাই মনে হল নিরাপদেই আছি। রাগ পড়ে গেলে বাসায় ফিরে যাব। ভাবতে ভাবতে দেখি ঐ বাসায় বুজবুজ ফিসফাস। মনে হলো আমাকে নিয়েই। বান্ধবীর ভাই আগে থেকে ঘুরঘুর করত। তার মা এলো আদর নিয়ে, স্নেহ নিয়ে। আর আমি অবশ হয়ে গেলাম আমার বুদ্ধির কাছে। ঘোর যখন কাটলো তখন দেখি, আমি বাসর ঘরে বসে আছি বউ সেজে। নতুন লাল শাড়ি পড়ে। ১৪ বছরের কচি বউ। কি মজা!

মজা না ছাই। অনেকদিন সেই আতঙ্কে আঁতকে উঠেছি। পরে অবশ্য মজা পেয়েছি বহুৎ। তবে দিয়েছি বেশি। সেটা এখনও সেই প্রাক্তনকে হতাশ করে। আমার সেই নাবালক বিবাহের হারামি সোয়ামি রে। এখন বলে, কি যে হারাইলাম।

সেই হিসেবে বলতে গেলে আমি তোমারে কত সম্মান করি, কি বল?

সে কথা তো আমি বলি। তুমি তো আমার গুরু। আমি শিষ্য। আমি নিজেকে সম্মান করতে শিখছি তোমার কাছে।

জানো তো গুরু কাকে বলে? যে কাউকে বিশেষভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে সেই গুরু। আর সাধনা করতে হয় গুরু-শিষ্য দুজনে মিলে। একা একা হয়নাকো গুরু শিষ্য।
রাখতো নিজস্ব তত্ত্ব। তুমি গুরুমশাই, আমি গাবতলী!

একদিন খুবলে শীলাবৃষ্টি হল। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সবাই যেন এই শীল উৎসবে মেতে উঠেছে। ওর গলায় তুমুল উল্লাস নেচে উঠেছে। বরফখণ্ডগুলি যেন ওর কন্ঠে আনন্দ দেখতে পাচ্ছিল। ওর পাগলামিতে বিভোর হয়ে যাচ্ছে। ওর বাক্সের মতো বারান্দাটুকু যেন ছোটবেলায় দেখা চরের তরমুজ ক্ষেত। শীল পড়ে পড়ে সবুজ তরমুজগুলির শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে লাল রং বেরিয়ে এসেছে। আনন্দ আর ব্যথা লাগছে একসাথে।

ওদের দিনগুলিতে একটা কচ্ছপ সাজিয়ে রাখবে বলে ভাবছিল, আজ যেন সেই কচ্ছপ বাচ্চা দিয়েছে একটা। দেখো তো কি করি। আরেকটা দেহকে জন্ম দিচ্ছে। দেখোনা যুদ্ধজাহাজ, দানব না অস্ত্রোপচার পালিয়ে থাকতে থাকতে বিপ্লবকে ভুলে যাচ্ছে। দৈব মানবিক উন্নয়নে নিয়ত তোমার হাতের মেকি আশ্বাসকে ভালোবেসে ফেলেছে। তোমার সাজানো খরচকে বিশ্বস্ত মনে করেছে। তোমার ভুল ওষুধ আমার জন্য

নিরাময়। আমি কিভাবে তোমাকে মাইনাস করব। দিনের পর দিন আমি আমার দিনগুলি বসে দেখেছি। ডিম ফোটার চেনা চেনা অচেনা আয়নায় চুলগুলি সাদা হয়ে আসে। ওই চুলগুলিকে বিশ্বাস করিনা। মনে হচ্ছে অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে তা' দিয়ে যাচ্ছি পৃথিবীর শুদ্ধতম দুটি ডিম। অপার বিস্ময়ে নিজেকে ভাবি আমি। একটা কাগজ কেনার আগে সবাই দেখতে চায় তা সহজে ভাঙ্গে কিনা। তাই সবার কাছে আমি খুশিতে রসের পরিচয়ে থাকতে চাই। স্বপ্নের ভিতরেও আমি ধানুশের প্রাসাদে শুয়ে থাকতে চাই। বহুভুজ রসের গোলগোল বীজের মত টানেলে ছলছল আর্দ্ররসের সান্নিধ্যে আমার মাথায় আর বস্তু নয়, আকার খেলা করে। মিষ্টি আর টক কাজ করে। বিস্ফোরণ আর ভয় কাজ করে। দিনকানা ঠিকানা থেকেও আমার নাই ঠিকানা।

তুমি গ্রামের যে এত গল্প কর, তুমিতো গ্রামে থাকো নাই।
না থাকলে কি হবে, ভালোবাসা দিয়ে দেখলে সবই আপনার। তাছাড়া আমার নজর খুব। আর সবসময়ই আমি জিনিসটার ভিতর সহজে ঢুকতে পারি। আমার কোন মান অপমান নাই। যে কাউরে যেকোনো কিছু করতে বা কইতে পারি। আমি কারো কাছ থেকে কিছু চাইলে অবশ্যই পাই।
'চাপা মাইরোনা। ভালো লোকগুলোর সাথে দেখা হয়েছে বলে এমন মনে হচ্ছে।'

আরে নাহ, কত লোকের সাথে দেখা হয়েছে, আমারে কেউ ক্ষতি করতে পারে নাই। চেষ্টা করছে অনেক, কদর্যভাবে চেষ্টা করেছে, পারে নাই।

ভেবেছিল পার্লারে ঈদের সময় কিছু ব্যবসা হবে। একদম কাস্টমার এলোনা। দুদিন আগে এক মহিলা এসে অনেক কাজ করালো। শেষ হলে বলল টাকা তো সাথে আনি নাই বাসা থেকে এনে দিচ্ছি। বিশ মিনিট লাগবে, ঐতো বাসা। সেই যে গেল আর এলোনা। কথা বলে মনে

হয় নাই মেয়েটা এত টাউট। সেই রাতে একটা স্বপ্ন দেখল। ও মারা গেছে, কবরে শুয়ে আছে। কাফন মোড়ানো। গোরস্থানের নিরিবিলিতে সুমিতা (পার্লারের মেয়েটা) কাফন খুলে ওর শরীর থেকে কি যেন বের করে নিচ্ছে চামচ দিয়ে চেছে চেছে। শরীর শিথিল হয়ে গেছে যেন খুলে পড়বে। ও মেয়েটাকে বলছে, তাড়াতাড়ি কর তাড়াতাড়ি, নইলে মাংশ খুলে পড়তে পারে। মেয়েটা আপ্রাণ চেষ্টা করে ওর হাড়-মাংশ খুঁটে খুঁটে যেন বের করছে ওর সর। সাদা, ঘন বেশ বড় একটা বাটি ভরে যেতে লাগল। একবাটি শুভ্রতা পুরোটা বের করার পর হঠাৎ চারদিকে অন্ধকার করে ধূলিঝড় শুরু হল। পুরা গোরস্থান ধরে ধুলায় আচ্ছন্ন। কিছু দেখা যাচ্ছে না। এইভাবে বসে রইল। অনেকক্ষণ পর ঝড় থামল, চতুর্দিকে খড়কুটা পাতা ডাল কিন্তু আশ্চর্য বাটিভর্তি সাদা পদার্থটার গায়ে কিছু লাগে নাই। অপূর্ব জোসনায় ছল ছল করছে। ওর খুব কষ্ট লাগছে। সুমিতা ওর শুভ্রতা নিয়ে যাচ্ছে পার্লারে বিক্রি করতে।

তোমারে খুব মিষ্টি খাওয়াতে মন চাইছে, কি খাইবা? ও বলে: রসগোল্লা আমার প্রিয়। আর তৎক্ষনাৎ আমি দেখতে পাইলাম একটা দোকান-ছোট তস্তরি থেকে শে একটা প্রমান সাইজের গোড়াচাঁদ দাস রোডের শশী মিষ্টান্ন ভান্ডারের গোল্লা তিনআঙুলে তুলে নিয়ে এমন ভাবে মুখে পুর্ছে, যেন ওর দাঁত দুটা দেখা না যায়; অনেকটা নাক চুলকানোর ছল মনে হয়। গোল্লা খাবার সময়টা কে আর এমন মনোরম করে পরিবেশন করতে পারে.. শে ছাড়া!

বহুদিন আগে আরেকটা স্বপ্নের কথা মনে হল তার। ওটা স্বপ্ন না বিভ্রম না বাস্তব ছিল এখনো বুঝে নাই। বিকালে খাটে শুয়ে আছে। কে যেন ওকে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। দেখে রুমের দরজায় ছেলেটা দাঁড়িয়ে। কি যেন বলবে, শে জবাব দিতে গিয়ে উঠতে চাইছে হঠাৎ এক অদৃশ্য হাত ওর হাতদুটো ধরে আটকে ফেলল বিছানায়। তারপর হাতের নখের মাথায়

ছিদ্র করে ঢুকে পড়ল ওর শরীরে। শে বুঝতে পারছে একটা তীব্র ব্যথা আঙ্গুল হয়ে শিরা উপশিরায় পৌঁছালো। খামছে ধরলো তীব্র ব্যথা, দমবন্ধ করা মৃত্যুর আগের অবস্থা নেমে এল। সেই বিকালের পর প্রায়ই দেখে কতগুলি কালোকুচ্ছিত প্রাণী ওকে ঘিরে নেচে নেচে জ্বালাতন করছে। আর ওর দমবন্ধ হয়ে আসছে। বেদনায়। একদিন মামা একটা সূরা শিখিয়ে দিল। শে তখন ওই শয়তানগুলিকে দেখলে সুরাটা পড়ে ফুঁ দিত, ওরা ভষ্ম হয়ে মিলিয়ে যেত।

চার মাস ধরে চেরি টমেটোর দেখা নাই। অনেকদিন দেখা না হলে ওর চোখগুলি এইরকম চেরি হয়ে যায়। শে বলেছিল প্রতি ঋতুতে একবার সামনাসামনি দেখা হবে। হেমন্ত, শীত চলে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। সেকি হঠাৎ ধর্মগ্রস্ত হয়ে পড়লো? মাঘের শেষ বিকাল। সারাদিনের ঠাণ্ডা বাতাস শেষ সূর্যের স্পর্শ নেবে বলে একটু একটু বইছে। একবার আসতে বলল তাকে। আসার কথা ছিল, শেষ মুহূর্তে আসতে পারলোনা। তার কাছ থেকে সমুদ্রের নোনা হাওয়া এসে বুকে লাগল। শ্বাসকষ্ট নয়, অন্য এক ঠান্ডা করা বাতাস যেন। কতদিনের প্রাচীন আর অবলুপ্ত প্রাণী। বাস্তবে নাই। তুমি আসলেনা, তাই ওর ভাব আসলোনা।

শে তার নখগুলিতে কালার লাগিয়ে বসে ছিল।

কেন এলেনা?

এইতো কত সমস্যা। ডান হাতের আঙ্গুলটা গতকাল থেকে নাড়াতে পারছিনা। দুপুর থেকে হাঁটুর কাছে কামড়াচ্ছে।

তোমার কত অজুহাত। গত একমাস ধরেই এমন গল্প আমি শুনেছি। এপর্যন্ত তেইশটা কারণ দেখিয়েছো না আসার।

না অত হবে না, দুই-তিনটা হবে। আর বলেছি তো, আসবো না। কারন নাই। দেখছোনা কারণগুলির কথা পরে বলছি। আগেতো বলিনাই।

ঠিক আছে, সব সত্যি।

তাহলে কি আমি মিথ্যা বলেছি?
দেখো তোমার না আসাটাই শুধু মিথ্যা, বাকি সব সত্য। আর তুমি যদি আসতে তাহলে সেটাই হলো একমাত্র সত্য। বাকি সব মিথ্যা।

গলা ভারী লাগছিল। ঘুমাচ্ছিলে নাকি?
না একটু জ্বর জ্বর।
কেন?
গলা ব্যথাও আছে। কাল রাতে তিনটায় গোসল করেছি।
এত রাতে?
সাড়ে বারোটা থেকে মুভি দেখেছি, এক্স। তারপর অনেক সময় নিয়ে খেলেছি। গলা ব্যথা হয়ে গেছে।
পুরোটাই গলায়?
আরো অনেক কিছু... আহ...! হাই তুলল আদরের বিরানি!

আহা আমরা কত ভাগ্যবান। আমাদের সেইসব পূর্ব পুরুষদের চেয়ে। তারা ৭২ আরপিএমে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে শুনত আঙ্গুরবালা। যার প্রতিটা গানই দম দিতে হতো, আর বদলাতে হতো পিন। আমরা কত না অনায়াসে শুনে যাচ্ছি পোস্ট-আদিবাসী কানায় কানায় ভরা সুর। নাচানাচি চলবে শরীরের ভেতর। একলা চলতে গিয়ে পাওয়া যাচ্ছে। কোন এক দেহ-মনের মতই খেলা করে অগণিত আমার ইনস্ট্যান্ট জীবন। এমন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে ফেলেছে শে, আর রেহাই নাই। এই বাস্তবতাকে কল্পনা থেকে রক্ষা করার।

ছন্দে ছন্দে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে চেনা-অচেনা চুল। একটা অর্থহীনতা। তোমাকে মারতে চাই। পিটতে চাই। আর এর কাছে চাই। তোমার সমস্যা হচ্ছে, তুমি সব কিছুর ওপরে তুমি ভার্চুয়াল। কেন এমন হলো, যখন তোমার ভালবাসার দরকার হয়, তখন আমাকে খুঁজে নাও। আর আমার

যখন ভালবাসার দরকার হয় তখন তুমি ব্যস্ত তোমার বিউটি পার্লার নিয়া। তোমার কাজের বুয়া নিয়া। তোমার রিক্সা চড়ার গল্প নিয়া।

গালি :
তর মারে চুদি খানকির পোলা
ধইরা এক্কেরে হান্দাইয়া দিমু
যেইখান দি বাইর হইসিস হেই হেন্দি দিয়া

দুর্যোগ মায়ের সাথে। মায়ের সাথে সেই বাড়ি ছাড়ার ১৮ বছর পর কথা হল সেই সব নিয়া। অন্য একটা ঝগড়ার মধ্যে হঠাৎ মা চিৎকার করে জিগায়:

তুই দুইবার বিয়া করলি কেন?

দরকার হইলে আরো দশবার করবো, তোমার কি? তোমরা কি কখনো চাপ দিছিলা আমারে, কোন কিছু না করার জন্য? কখনোই তো আমার কেউ নাই। আমাদের ছোট রাইখা চাকরি করছ সারাদিন। ঘরের বাইরে থাকছে মেয়েটা। কি করতেছে, কার সাথে আড্ডা দেয়, কোন খবর রাখতা কিছু?

আমি না হয় ভুল করছিলাম কিন্তু তখন কেন ধমক দিয়া কও নাই, এটা করবিনা। এখন বড় বড় কথা কও। আমার জীবন আমার। এখানে আর কারো হাত নাই।

তোরে নিয়ে আমরা কম জ্বলছি? টাকার টাকা গেছে। মান-সম্মান গেছে। তারপরও তো তোরে ঘরে আনছি। আমরা এখন তোরে নিয়া খুব ক্লান্ত।

তখন বুঝল ভয়ঙ্কর শক্ত একটা অবস্থা ওকে দিশাহারা করেছে। এতদিন যে যা চাইছে তার কথা ভাইবা তারে সন্তুষ্ট করছি। আর না। এইবার আমারটা করবো। তুমি না আমারে শিখাইছ, আমার নিজেরটা

ভাবতে। এখন আমি নিজেরটা ভাবি। আজ আমার শরীরে দেখো কোন সাড়া নাই। তোমারে কোন আদর করতে পারব না। আমার মন খুব খারাপ। আমি একটা নষ্ট পোকা। সব সুন্দর সুন্দর জিনিস নোংরা করে ফেলি। পঁচায় ফেলি। আমার যখন যা ইচ্ছা করে। আমার খুব লাগামছাড়া আবেগ। আমার মন যা চায়, তাই করি। বর্তমান মুহূর্তের কথা মাথায় নিয়ে অতীত ভাবিনা। সবকথা মনে থাকলে পাগল হইয়া যাইতাম।

তুমি কি জানো, তুমি একটা পাগল। তোমার অনেক প্রেমিক। রাতের পর রাত তুমি ভুল করেছো।

এই বোকাচোদা, প্রেমিকদের কাছে এমনি এমনি গেছি নাকি? প্রথম বিয়ার জামাই তো তখন মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী। শাশুড়ির সংসারে থেকে দেখো! আমি খুব মেধাবী ছিলাম। কিন্তু সেখানে আমার লুকাইয়া পড়তে হৈত। তাও ফার্স্ট ডিভিশন।

প্রথম বিয়ে হয় তখন আমি নাইনে পড়ি। মার সাথে এক সন্ধ্যায় রাগ করে বাসা থেকে বাইরে যাই। কারন ওইদিন বাইরে ছিলাম। স্কুলে ভলি প্র্যাকটিস করে বান্ধবীদের সাথে গল্প করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। মাকে বলে আসি নাই। আর কোনদিন পারবো না। আমার চোখ ইঁদুরের চোখের মতো নিষ্প্রভ হইছিল সেদিন। কাতর পলাতক চোখজোড়া অভিমান আর অসহায়তা জমে বরফ পাথরের বাসা। গেট থেকে বাহির হয়ে ভাবি কই যাই! তারপর সারাটা দিন চলে গেল বান্ধবীর বাসায়। পরেরদিন। তারপরের দিন। কেউ খবর নিল না। অসহ্য রাত কাটল। ভাবলাম ফিরে যাই। কিন্তু আমাকে ফিরতে দিল না এই মা। তৃতীয় দিন সকালে বান্ধবীর ভাই আমাকে প্রস্তাব দিল আর সেদিনই দায়সারা গোছের বিয়ের হলো। আমার বয়স তখন ১৪ বছর ৩ মাস ২৪ দিন। হায়রে, আমার তৃতীয় বিশ্বের মফ:স্বল শহরের শিক্ষিত

নিম্নমধ্যবিত্তের ঘরের সুন্দরী কিশোরীর সরল মা। লক্ষ্যভেদে লক্ষ্যহীন যে!

তুমি হলে এক পথের ধুলা। হঠাৎ সেদিন আমার সামনে এলে, আমিতো চমৎকৃত। কিভাবে এলো এই ধূলা। তারপর দিনে দিনে সময় গেল, তুমিও একটু একটু করে জমে উঠলে। মনে হলো মনের অংশ হলে।
আজ এক বাতাসে উড়ে যাবার সময় হলো।
তুমি তো আমাকে আবার পথে নামায়ে দিলা।
পথের ধুলার এইতো পরিণতি। আজকাল প্রায়ই টিয়া পাখি উড়তে দেখি।
সবুজ হলুদ টিয়া, ব্যাটিং ঝড়ে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়া।

সকাল দশটার পর থেকেই অপেক্ষা করছিল। সাতমসজিদ রোড সাপের মত যানবাহনের চাপে ফুলে উঠেছে। আবার কিছুক্ষন পর জিরিয়ে নিচ্ছে। এগারোটার তীব্র রোদ। মানুষের মুখের তেমন ব্যবহার নাই। গাড়ি রিক্সার জাম, চিৎকার চেঁচামেচি ছাড়া আশাহীন মানুষ। কাপড়ে মাথা ঢেকে বসে লালালা পান করছে। চলমান স্থবিরতা। শিশু স্কুলের ছাত্ররা দিনের খাঁচায় লালন পালন হচ্ছে। মায়েরা স্কুলের সামনে বসে মাতৃত্বের যন্ত্রণায় ক্লান্ত পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে না। কাচের পরান থেকে একটা মেয়ে মাথা বের করলো। একজন রোদের ভালুকায় সবুজ গাছে ঘেরা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল। আরেকজন দালানের দিকে তাকিয়ে আছে। আরেকজন বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের সাথে। স্কুল মসজিদের সাথে। মসজিদ ব্যাংকের সাথে। ব্যাংক মার্কেট এর সাথে। মার্কেট এপার্টমেন্টের সাথে। এপার্টমেন্ট দোকানের সাথে। দোকান কিন্তু মানুষগুলিকে দেখে। মনে হয় না মানুষের সাথে তার সংঘর্ষ আছে। হাঁটা পীর আজ এই পথ দিয়ে যাবে। পায়ের সাথে মিশে ফেলবে সব ধূলা। এটা ঠিক, কিন্তু কখন, তার কিছু আগাম কেউ বলতে পারেনা। আজকাল তার পিছনে পিছনে যারা আছে তাদের রকমসকম কেমন যেন চাপা, রহস্যঘেরা। টিফিন

ক্যারিয়ার, পানির ট্যাংক, কলার ফানা, পেয়ারায় পলিথিন। দেখলেই মনে হয় এখনই কোথাও বসে আরাম হবে। মনোবাঞ্ছা পূরণ। এ হাটাপীরের পেছনে থাকা অব্যর্থ। একটা না একটা পথ পাওয়া যাবেই।

একদিন আমাকে ফোন করে বলে এক ছোটভাই: ভাই আপনি আছেন কই? আপনারে দরকার আজ।

বিকালে বাসায় আসো। একটা জিনিস আছে দিতে। সন্ধ্যায় বোতলটা কিনে নিয়ে আসলো। সে কথায় কথায় বুঝালো অন্য ব্যাপার। বললো বান্ধবী আসতেছে বিদেশ থেকে, যার সাথে বিয়ে। এদিকে একটা ঘটনা ঘটছে। গত সপ্তাহে ও বনানী এক হোটেলে নারী সঙ্গ করেছে। এখন ভয় হচ্ছে যদি এইচআইভি পজিটিভ হয়ে পড়ে। তাইলে তো মহাবেইমানি হইব। বান্ধবীর সাথে এখন কি করা যায়। ওরা রাস্তায় হেটে কথা বলছিল। হঠাৎ ও আবিষ্কার করে হাটাপীর দলবলসহ যাচ্ছে। আমি বললাম, চলো ওদের সাথে হাটি। আর কথা বলি। ও বলে, ভাই, একেবারে বেকুব হয়ে গেছি। কি করা যায়? কি করা যায়? ইউরোপের মেয়ে, ওদের নৈতিকতা আলাদা। জানলে বিয়া হবে না। আবাহনী মাঠ পার হয়ে তখন ওরা তাজউদ্দিনের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। পীর মিছিলের সামনে, এখন মাটির দিকে মাথা ঝুঁকে নির্লিপ্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। কয়েকজন অতিভক্ত দফায় দফায় সামনের মানুষদের সরাইয়া দিতেছিল।

তার সমস্যা হঠাৎ আমাকে স্পর্শ করল। হেঁটে যাচ্ছিলাম ইবনে সিনা মেডিক্যালের সামনে দিয়ে। ওর কোমরের বেল্ট ধরে টেনে মিছিল থেকে বেরিয়ে আসি, আর ঢুকে যাই রিসিপশনে। লোকটাকে বলি, ভাই, এইচআইভি আছে কিনা জানতে কি কি টেস্ট হয় বলেনতো। সে কয়েকটা টেস্টের নাম বলে। ছোট ভাই বলে, জয় রাধে! বলে বুঝে নেয় কী করতে

হবে! আর টাকা জমা দেয়। রক্ত আর পেশাব পরীক্ষা করতে দেয় আর সন্ধ্যা হতে হতে বেরিয়ে আসে ফুরফুরে মেজাজে। হাটাপীরের কল্যাণে ওর মনবেদনার সমাধান হলো।

সময় কি গোল? নাইলে ঘড়ির চেহারা গোল কেন? ডিজিটাল ঘড়ির সংখ্যা বললেই, ঠিক কত সময় চলছে এটা বুঝা যায়। কিন্তু প্রতিদিনের সময়ের জন্য সময়ের সংখ্যাটা শুধু চায়না মানুষ। সময়ের প্রভাব উপলব্ধি করতে চায়। যাতে করে বুঝতে পারে সে কতটুকু সময় পার হয়েছে, ঘুম ভাঙার পর। আর কতটা বাকি আছে আজকের বরাদ্দ করা সময়। গোল ঘড়ি অতিক্রান্ত বা আসন্ন সময় ধারণা দিতে খুব পারে। আর সংখ্যা ঘড়ি শুধুমাত্র একটা মুহূর্তকে প্রদর্শন করে।

একটা নতুন ঘড়ি হতে পারে। ধরা যাক তার নাম স্কেল ঘড়ি। বারো ইঞ্চি মাপের তিনটে স্কেল পাশাপাশি রাখা। প্রতিটা স্কেল ১২টা ছোট ভাগে দাগানো। পূর্ণদৈর্ঘ্যটা ধারণা দেয় বারোটা থেকে পরের বারোটা পর্যন্ত। ফলে এর মধ্যে যেকোনো মুহূর্ত মানে সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা সংখ্যা ছাড়াও আসন্ন ও বিগত বারোটা থেকে কোন অঞ্চলে আছে তার একটা ধারণা দিবে। সহজেই বুঝা যাবে রাত তিনটা মানে, ভোর চারটার কিছুটা আগে। দুপুর বারোটা বাজতে বেশ দেরী। মিনিটের দাগটা বলবে কোনটার সাপেক্ষে তার অবস্থা। সেকেন্ডেরটা মিনিটের সাথে। তবে এটা মূলত সময় কে সাপেক্ষ ধারণায় বুঝে ওঠার। সময় তো সাপেক্ষ। যারা ঘরে বসে কাজ করে তাদের জন্য খুব কাজের হবে এটা।

একটা গভীর বিষাদ। শব্দের তরল ভয়। শব্দ থেকে শব্দে, মানুষের স্পর্শক সম্পর্ক সুতার বিলীন হয়ে যাবে। সমন্বয় থেকে একা হবে। তারপর নিজের থেকে একা হবে। মাছ কন্যা, মাছ পুত্র। বন্যার পানি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ভাটির দেশে পলির নদী। স্বতঃস্ফূর্ত

আলাপ: কই খৈনি বানাও। সব সবজি কাটুম। দু'টুকরা পটলগুলো গরু, মিষ্টি কুমড়া টুকরা টুকরা। এ ফোর সাইজের বেগুন, ফানি একটা গাজর, আধা পেঁপে, বরবটি দাও, পপির টুকরা যতোটুকু লাগে নাও। বেশি নেয়া নষ্ট কইরেন না। বড়লোক হতে পারে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। আমি যেন একটা ডাইং ফ্যাক্টরির বিশাল স্ত্রীর নিচে। চ্যাপটা হচ্ছে একটা ভীষণ চাপে। তার শরীর চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে আছে। হরিণের ঝাল শীতের মধ্যে চেহারাটা। হাত-পা দেখো। আঁকা ওর ইচ্ছা-অনিচ্ছার। ত্যাগ আকাঙ্ক্ষা সব পালিয়ে গেছে। খবর পেল শ্রাবণ মাসে বজ্রসহ বৃষ্টি হলে নদীতে ইলিশ আসার তাগিদ আসে। ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ চমকালে পিতা হবে হেমন্তের শুরুতেই। আব্বার কথা মনে হচ্ছিল। ওর এই বয়সেই উনি মারা গিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর থেকে তার সাথে তেমন যোগাযোগ আর হয় নাই। হঠাৎ হঠাৎ কথা বলে ওঠে। কিরে পন্ডিত কেমন চালাচ্ছিস। প্রথম প্রথম চিনতে পারতো না। কতদিনের কথা। সব অল্প চেতনায় শুয়ে আছে। পরপর কয়েকদিন হলেই চিনে ফেলে। ও আপনি? হাসির মৃদু গন্ধ পাই। আপনারে দেখতেছি আমি। কয়েকদিন আগে একটা সিংহ দেখছি স্বপ্নে। অথচ স্বপ্নই দেখি না বহুদিন। স্বপ্নে মনে হচ্ছিল রোগা একটা সিংহ। বড় রামছাগল সাইজ। একটা টানেল গ্যালারিতে বসে আছে। সম্পর্কে ট্রেনের অন্ধকার ভয় পাওয়া জার্নিতে। ভোরের দিকে। ব্যাপারটা বুঝতে কিছু সময় লাগছিল। বুঝলো মাথার ভেতর একটা গভীর ব্রিজ হয়েছিল। বহুদিন আগে ঘুমিয়ে ছিল। বহুদিন বয়:সন্ধি থেকে সে আটকে রেখেছে নিজেকে। যৌবনের চরম খামখেয়ালিপনা বেশি দামে কিনে কম দামে বিক্রি করার বিষাক্ত প্রবণতায়। খেলায় খেলায় জীবনের প্রধানতম প্রতিবেদনগুলি লেখা হলো না। কিন্তু আমি থেকে গেলাম। আজ যেন সময় হয়েছে আর আমি জেগে উঠছি। আমিই আমার তোমার আব্বা। মনে হয় তার কথা বলা, স্বর প্রক্ষেপণ উপমা-উৎপ্রেক্ষা কথকতা। হাসিহাসি গন্ধভরা আব্বা যদিও ২৫ বছর যাবত তোমাদের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন, তারপরও ওনাকে তেমন পুরানো মনে হচ্ছে না। তবে দৃষ্টিভঙ্গির বিশদ

একটা পরিবর্তন টের পাচ্ছি। কথাবার্তায় গত শতাব্দীর আশির দশকের আন্তরিক সাদামাটা ভাব-ভঙ্গি কেটে উঠেছে।

তোমার জন্য আমার মনটা কেমন করছে। পিঁপড়ার চলাচল মনে হতে পারে। আশেপাশে চিনি আছে মনে হয় সেই রকম। কবে শনিবারের রাতের রাস্তায় কুয়াশায় তুমি। রাস্তার পাশে জবুথবু তোমার সংসার। ক্লান্তি ক্ষুধা নিয়ে শুতে যাওয়া চোখ। জীবনের লব্ধি কি? শব্দটা শুধু পদার্থবিদ্যার বইতে ছিল। দুই বল দুই দিক দিয়ে টানলে প্রস্তুত লব্ধি। যেদিকে যায় সেই নম্বরটায় লব্ধি। এখন জীবনের লব্ধি কি? সহজে আমরা বেঁচে থাকাটাই। লব্ধি মানুষকে কয়েকটি ভাগে চলাচল করতে পাঠায়। দেখা যায় আন্ডারগ্রাউন্ড চলাচল করা মানুষেরা এটা করত নিরাপত্তার জন্য। এখন সবাই উত্তর আধুনিক জীবনে সহজ এবং ব্যবহার শীর্ণ হয়ে পড়েছে। সত্যি সত্যি বইয়ের বাস্তবতা ভুলে কি ই-বুক, ই-রিডার বাজার দখল করে নেবে?

।৮।

প্রথম বারেই বুঝতে পারলো মিলনের সময় ও একেবারেই সহজ। ওর পর্যায় গণনা, যখন যেটা করার সেটা করে দেয়া, নিজের যা প্রাপ্য তা আদায় করে নেয়া... সব একটা সহজাত ছন্দে গাঁথা। সব যেন ওর ইচ্ছাতে হচ্ছে। যদিও মনে হয় এবার একটু থমকালো।

অজস্র চুমুবর্ষণে ভিজে সিক্ত হতে হতে যেন আরো ক্ষুধা বেরোয়ে পরছিল। যেন সারাক্ষণ লেপ্টে থাকবে, সেভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছিল।

তোমার চোখে দেখি ডাবল আইল্যাসের লাইন? হাতে আঁকছো নাকি? কি সুন্দর।

আরে না, এইটা আল্লার দেয়া। কিছু কিছু মানুষের এরকম হয়।
তা, তুমি এত তাড়াতাড়ি বুঝলা কেমনে?
গভীর ভাবে তাকালে সব চোখে পরে।

তোমার এই সহজাততা কেমন হৈল?
কেন আমি তো বিবাহিতই, হবে না?
তা বলে এতো?

তখন ওরা থাকতো ক্যান্টনমেন্টে, স্বামীর সাথে ব্যারাকে। বাসায় শুধু একটা চার বছরের বাচ্চা। অস্থির সময়। সেই সময় ওর একজন প্রেমিক হলো। সুদর্শন, ভিডিও ক্যাসেটের দোকান ছিল। ক্যাসেট আনা নেওয়া করতে করতে ভাব হয়ে গেল। পিছনের রুমে ওদের মিলন হত। ছেলেটার বাম হাতের একটা আঙ্গুল কাটা। সে সময় ওরও ডান স্তনটা একটু ছোট ছিল, ব্রাতে আলাদা প্যাড পড়তো। সে যখন প্রথম তার

কাটা আঙ্গুলে ওর স্তন জামা খুলতে গেল, প্যাডটা দেখে এত অবাক হয়েছিল যে, অনেকক্ষণ শুধু মিটিমিটি হাসছে। এত মজা ছিল দিনটা।

তোমার চুমু এত মজার যে আমি সারাজীবন তোমার দাসী হয়ে থাকতে চাই এই চুমার জন্য।

: বল কি, তুমি এখনো শরীরে রহস্য রেখে দিছ। তোমার মনে এখনো কিছু বাকি আছে? এই যে বল সবই নাকি দেইখা ফেলছ? পুরুষ মানুষের কিছুই আর জানতে বাকি নাই তোমার?

মাইর দিমু। কি বল এইসব। আছে আছে। বোঝ না ! খুইজা নিলে পাইবা। এইযে তুমি পাইলা। আমি জীবনে কাউরেই আমার ঠোঁট এইভাবে দেই নাই। তোমার মত এমন গভীরে কেউ টাচ করতে পারে নাই। তুমি আমার দেমাগে ধরছগো। তোমার কাছে এমুন ধরা খাইছি!

: কেমনে পাইলা এই প্রতিভা? এখনো মনটারে খোলা রাখছ। আমি তো কোন ময়লা দেখতেছি না তোমার ফ্লোরে।

শোনো, মরুভূমির পাথর কেমন মসৃন হয় না... কেন জানো ? ওর উপর দিয়া অনেক কিটকিটে বালি উইরা যায়... যত ধারালো পাথর হোক না কেন, সময়ের উড়াল ওরে একসময় মোহনীয় করে ফেলে। এটাই নিয়ম।

আমি কিঞ্চিৎ ভচকাইয়া যাই। টাইম কৃষ্টাল মাথায় ঘুরতে থাকে। ওর দেহে সময় বন্দী হয়েছে? ওর কথাবার্তা হঠাৎ করে কেন অন্য রকম হয়ে ওঠে। কিছুটা দার্শনিক, কিছুটা চতুরামি। কোনটা যে ঠিক কে জানে?

হাসি হাসি মুখ করে এই সব কমপ্লিমেন্ট উপভোগ করে। আর ও ফিরে যাবার সময় কয়েক গ্রান্ড টাকা ঢুকিয়ে দেয় ওর ব্যাগের পকেটে। ওর দেখা না দেখার ফাঁকে। ভাবি, না দেখুক, তবে পরে যেন পায়। আস্তে আস্তে ওর সংগটাকে হালকা লোভ দিয়া কন্ডিসন্ড করতে চাই। ওকে বুঝতে কাজে লাগবে।

একদিন আষাঢ় মাস। বিকাল থেকেই ঝরঝর। রাস্তা শুনশান। শুধু সন্ধ্যার দিকে সেই পাগলুটে অন্ধ ভিখারি লাঠি ঠুকে ঠুকে ভিজা পথ দিয়ে যাচ্ছে। খানিক পর পর চিৎকার করে বলছে: 'আল্লাহ! ওহ!' সেই কন্ঠস্বর অপার্থিব মনে হল। একটা কড়া মেজাজের পাখি যেন গলা ফুলাইয়া জোরে ডাকছে এমন করে যেন বিল্ডিংগুলার ভিতরের বেডরুম পর্যন্ত যায়।

বারান্দায় বসে ছিলাম। একটা ছাতা নিয়ে চার তলা থেকে নেমে ওর পিছে পিছে যাইতে থাকি। বান্দা আমার দিকে তাকায়ই না। পাশে পাশে হেটে বলি: সাথে থাকি, কি বলেন! সে তেমন কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। এগিয়ে একা একা চলে যায়। তারপর অনেকক্ষণ হেটে ফেরার সময় তোমার ফোন। কান পেতে বৃষ্টির ভিতর হাটে আর এলোমেলো কথা বলে। একটা একা দাঁড়ায়ে থাকা অবশিষ্ট বকুলগাছ থেকে অনেক ফুল ফুটপাতে পড়ে আছে। সেখানে দাঁড়ায়ে আবারো এলোমেলো কথা বলি। এভাবে দুজনের ফোনের ব্যালেন্স শেষ হবার পর বাসায় ফিরে আসি। পরদিন একটা প্রেজেন্টেশান আছে। যদিও জানি এটাও হবে না। তবু রাত জেগে কাজ করি। অনেক রাতে সেই ভিখারি লোকটার ডাক শুনি। 'আল্লাহ! ওহ! রহম করো' বলে বলে সে ভিক্ষা করে ফিরছে। এই বৃষ্টিবহুল রাতে তার নিশ্চয়ই কিছু বান্ধা দাতা আছে। এমন ডাক শুনলে কার দিলটা শক্ত থাকতে পারে? অনেক বৃষ্টি তখন। দেখি তিন তলা

সমান আমগাছের পাতা চার তলার নারকেল পাতাকে জড়িয়ে ধরেছে। ল্যাম্পোষ্টের আলোর একটা সরু ধারা সেখানে এসে আড়ি পেতে আছে।

গোপনতাই ছিল আমাদের মূল প্রেরণা।

কিন্তু পরস্পরের প্রায় চৌদ্দআনা বলতাম।

ওর মেয়ের নাম ওয়ার্দা জয়তুন। ডাক নাম অবশ্য প্রাপ্তি।

আর ছেলের পূরা নামটা মনে নাই কিন্তু ডাক নাম আশা। ছেলেটার এই নাম পছন্দ নয়। সে নিজেই তার নাম রেখেছে 'হোপ'।

আমি বলি: তোমার ছেলেটাকে আমার খুব পছন্দ হৈছে। ছোট বেলায় আমি এরকম রূপকুমার খুজতাম। কিন্তু আমাদের জেলা শহরে ঠিক সেই রকমটা দেখি নাই। একটা ঝকঝকে, উদাসীন চোখ আর মায়ের হাত এলোমেলো করে দেয়া চুল! সিল্ক সিল্ক। আমার চুলও এরকম ছিল।

আমিও আজ কয়েকদিন ধরে চুল রিঠা দিয়ে ধুই। দেখ, কেমন চকচক করতেছে! আমার ছেলেটা খুব মাতৃভক্ত। আর রোমান্টিক। আমারে কেমন করে জড়াইয়া ধরে, যেন পৃথিবীতে এমন আশ্রয় আর নাই। সবচে বেশি ধরে পেটের কাছটাকে। শাড়ি পড়া থাকলে আমার কেমন গা সিরসির করে। মনে হয় আবার ছোট্ট করে পুচকিটারে পেটের ভিতর লুকাইয়া রাখি।

হঠাৎ ইলেকশন সামনে আসায় দেশে খুব গোলযোগ শুরু হৈল। প্রতিদিন রাজনৈতিক ক্যাওয়াস। নানা কারনে খুনাখুনি চলতেই থাকলো। রাস্তাঘাট খুব উত্তেজিত।

তারপর আর্মির হস্তক্ষেপে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এল।

একটা চাপা যৌনতাড়নায় ও তখন বেশ ভারিক্কি চালে ফুরফুরে উড়ছিল। দেশে একটা আপাত শান্তিভাব আসছে। চারিদিকে এতদিনকার ভাবমূর্তিগুলি ভেঙ্গে দিচ্ছে। চেষ্টা করছে প্রধান দুটি দলকে সমান শাসন করতে, কিন্তু দুদলই মনে করছে তা হচ্ছে না।

যৌনতার ব্যাপারে বুঝতে পারলো খুব দ্রুতই। পরিচয় হবার কয়েকদিন পরেই আমার জন্মদিন ছিল। শে দিনটি মনে রেখে বেশ প্রস্তুতি নিয়েই আসলো। দেখে আমারে স্টাডি কইরাই গিফট আনছে। ফুল, চকলেট, কলম ও আর একটা জিনিস, যেটার নাম বলা যাবে না। কারন তাতে গুপ্ত তথ্য আছে। ভিতরে ভিতরে প্রবল হাসি উঠল। বাহ, বেশ সাজানো গোছানো তো। স্ক্রিপ্ট করা মনে হচ্ছে! ও শুধু যেন আমাকে সেই চিত্রনাট্যের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে আসছে।

আমরা জার্মান কালচারাল সেন্টারের ছাদের রেস্তোরায় সারা বিকাল বসে রইলাম আর কাপের পর কাপ কফি খাইলাম। আরও কিছু খাওয়ায় অবশ্য মন ছিল না। শাদা শাড়ি পড়ে শে বেশ পেখম তুলে বসেছিল। রেলিংঘেঁষে একটা খেলার মাঠের দিকে মুখ রেখে বসেছিল, যাতে হঠাৎ করে কারো চোখে যেন না পড়ে। কফি নিতে ওঠার সময় বেশ কবার উঠতে হল। এরই ফাঁকে পাশ থেকে কে যেন বলছিল: কি দিন আইল, বয়স্ক মানুষের সাথে কম বয়েসিরা এখন বইসা থাকে।

সেদিন ওর ৩১, আমার ৪৯। কিন্তু সত্যি সত্যি মনে হচ্ছিল, এসব বানানো না। এসব সত্যি সত্যি ঘটছে। ট্রু ।

ওকে দেখলে প্রথমে মনে হবে, মহিলাটার কি যেন একটা অতিরিক্ত! একটু সটান ভাব, শরীরে কোন জড়তা নাই। কথার পিঠে কথা বলে যায়। একটু ভ্রু বাকানো, একটু শরীর মোচর দেয়া, খানিকটা জোরে

কথা বলেই আবার নিচু স্বরে স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া...। সব কিছু মিলাইয়া সাধারনত যে নারীদের দেখি আমাদের চারিপাশে, তাদের মত না। কিছুটা অতিরিক্ত। তবে ঢাকা শহরে নতুন আসছে, এই ভাবটা কথা বলার ভঙ্গিতে। এইটা শে সামলাইতে পারে নাই। এইখানেই তার পূরানো চেহারা দেখা যায়। জেলা শহর থেকে সোজা স্বামীর হাত ধরে আসছে রাজধানীতে। ক্যান্টনমেন্টে স্বামীর চাকুরি সূত্রে পাওয়া ক্যাম্পে থাকাকালীন সেই গন্ডির ভিতরে কিছু ঢং ঢাং শিখছে শুধু। কথা বলার আর্ট বলতে যেটা তার, তা অবশ্য আমার কাছে শিখছে।

শে অনর্গল কথা বলে যেতে পারে। সংসারের গোপন অগোপন, বলা যায় বা বলা যায় না জাতীয়, কোন ট্যাবু নাই। মুখটা একেবারে ফর্সা। মানে কথায় ফর্ফরা। গুপ্ত অগুপ্ত নাই। যৌন অযৌন নাই। কল্পনা আর বাস্তব নাই।

এই জায়গায় আমার কিছু কাজ করার আছে। ও কখনো আমার মত মানুষের সাথে মিশে নাই। সারাদিন বাণী প্রধান হিন্দি মেলোডির মধ্যে ঢুবে ছিল। সারাক্ষণ বকবক করে যেত। ঘর ঝাড়ু দেবার কথাটাও এমন করে বলতে থাকতো যে তা একটা গল্পের খসে পড়া অংশ। দেখা হবার আগেই তার ঘরের অনেক গল্প শোনা হয়ে গেছিল।

এরপর একদিন বললো: চল দেখা করি। দেখি ও তৈরিই যেন ছিল।
মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে যাবে, তার ঘন্টা খানেক আগে, কাল।

কিছুটা ভয়ে ভয়ে আনন্দ বেকারীতে ঢোকে। চেনাশোনা নাই এমন এক মহিলার সাথে দেখা করাটা যে খুব নিরাপদ না তা জানে। কিন্তু সেই আদিম কৌতুহল ওকে টাইনা নিয়া আসছে। দুশ্চিন্তা ছিল, কী চেহারা

না জানি দেখতে হয়। তাই ও ডার্ক গ্লাস পড়ে গেছে। দেখে শেও তার মুখ ঢেকে যায় এমন এক গাঢ়তর খয়েরি রোদ্রচশমা পড়ে আছে। ও যখন অর্ডার দেবার যায়গায় কয়েকজনকে দাঁড়ানো দেখে তাকে খুঁজছিল, তখন শে ই ঘাড় ঘুরিয়ে চেনার ভঙ্গি নিয়ে হালকা একটু ইশারা করল। কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। শে সেলসম্যানকে বলে: হাফ কেজি ড্রাই কেক দেন।

ও এক পা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া থাকলো। প্যাকেট ডেলিভারি নিয়ে টাকা মিটিয়ে দিতে দিতে বলল, খালি টাকা হারাইয়া যায়।... তখন দেখলো তার ব্যাগটা বেশ বড়, কাঁধে ঝুলানো। এরপর যতবার তাকে দেখেছে, সর্বদাই এরকম লার্জসাইজ মহিলা ব্যাগ দেখেছে সাথে। সেখানে একগাদা জিনিসপত্র, এলোমেলো করে রাখা। টাকাগুলি কই কই রাখছে নিজেও জানে না!

ওরা এরপর কাছে ছোট একটা কফি সপে বসলো। শে ই নিয়া আসল। বুঝলো, এটা তার চেনা যায়গা। ছোট্ট একটা শিশুতোষ টেবিলে মুখমুখি বসলো। টেবিলটা ছোট তাই ওরা দ্রুতই খুব মুখোমুখি বসার সুযোগ পেয়ে গেল। ওর আলজিভ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলো।
বললাম: কি খাবা?

ও বলল: এবার গ্লাসটা নামাও। তোমার চোখ দেখি।

'দেখা হে পহেলা বার, সাজন কি আখোমে পেয়ার'

সপ্রতিভ একটা মুহূর্ত। তারপর ডার্ক সানগ্লাশ খুলে সাধারণ চশমা পড়ে ওর দিকে তাকায়।

তাকিয়ে দেখে, তার চোখ জোড়ায় কিছুই নাই! কোন কিছুই না। ফাঁকা চোখ। সেখানে কোন বিচারের তথ্য নাই। অর্থাৎ আমার সাথে দেখা হবার পর তার ভাল লাগলো কি লাগলো না, তা বুঝা যাচ্ছে না।

ফেরার সময় খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এই রকম অবস্থা ঠিক কখনো হয় নাই। ওর ব্যাপারে একটা শাদা খাতা নিয়া আসছিলাম।

শে বোধ করি বাসায় ফেরার পথে ছিল। সময় গ্যাপ দিয়ে একটা ডায়লগধর্মী কথা লিখল। যা থেকে কিছুই বোঝা গেল না। আবার বুঝাও গেল। এরপর আমি শাহবাগ আজিজ মার্কেটে বইয়ের দোকানে আসি। দোকানে ঢোকার আগেই দেখা হয়ে গেল এক বন্ধুর সাথে। সে র' কফি খাওয়াইল। তবে এবারেরটা অন্য রকম। তাতে আগের লাচ্ছির বিস্বাদ ভাবটা কমল।

আমাদের কাজকর্মগুলা বাড়ার আগেই পরের বছর চইলা আসল। ভয়ংকর রকম লোডসেডিং সারা দেশে। কখন যে কি হয়। নির্বাচন নিয়া তুমুল চেঁচামেচি। তারপর ডামাডোল শেষ। নতুন সরকার দেশে।

ওর সাথে দেখা করার তেমন কোন কারন খুজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎই মাথায় একটা আইডিয়া কাজ করল। বললাম তোমার মেয়ে প্রাপ্তি তো গান পাগল। ওকে ছায়ানটে দাও না কেন? ওখানে গেলে চোখটাই বদলে যাবে। সুযোগও। ঠিকাছে, খোঁজ খবর দাও। দিলাম। বললাম কবে কিভাবে আসতে হবে। এক বিকালে ধানমন্ডি ২৭ নং রাস্তার পশ্চিম দিকে দাঁড়াইয়া থাকলো। তাকে নিয়া গেলাম ছায়ানটে। গেট থেকে বলল তিন তলায় যান। ওখান থেকে ফর্ম নিয়া নাম ধাম লেখার পর লোকটা আরেকটা স্লিপ দিয়া বলে: এইটা দিয়া যমুনা ব্যাংকে টাকা জমা দিয়া রশিদ আনতে হবে। সেটা কোথায়? ধানমন্ডি ৬নং এ। ও আমার দিকে রাগ রাগ চাহুনি দিল। বুঝালো আমাকে আবার তার দরকার। সকালে আসতে হবে কোন একদিন। সাব্যস্ত হৈল ২৫ তারিখ। ফেব্রুয়ারি।

জীবনে শে প্রথমবার কোন আধূনিক ব্যাংকে ঢুকল বুঝা গেল। ব্যাংকটা বেশ সাজানো, স্লীম। দেখলাম শে ও আটসাট করে শাড়ি পড়ে এসেছে। কনুই ঢাকা ব্লাউজের সাথে। টাকা জমার ফর্মটা লিখে দিলাম। অল্প টাকা, নিজেই দিলাম। শে কিছু বলল না। শুধু টকটক করে পরিবেশটা দেখেই যাচ্ছিল।

ছোট বেলা থেকেই ওর গোলাপের প্রতি একরকমের অনিহা কাজ করে। হয়তো পৃথিবীতে মনের মত গোলাপ নাই বলে তার বিশ্বাস।

একদিন তুমি খুব উৎসাহ নিয়া বললা, আমার একটা নীল রংয়ের লিপস্টিক চাই। ঠিক বিশুদ্ধ নীল। আমার কাছে মনে হল, তুমি একটা নীল গোলাপ চাইছো। ব্যাপারটায় খুব থ্রিল ছিল। ব্যাপারটায় খুব কিছু হয়ত ছিল না, কিন্তু আমার মনে হল, এটা খুব একটা ব্যাপার। এমন ও তো হতে পারে, জিনিসটা খুব সাধারণ কিছু না। ট্রু নীল বলে কী হয় তা আমরা জানি না। দোকানিও জানে না। কেবল দেখলে চেনা যাবে। কারণ পৃথিবীতে অনেক রকম নীলকে মানুষ পিওর নীল বলে জানে।

কিন্তু গোলাপ আর লিপস্টিক কি একই ব্যাপার? মনে হল, গোলাপই সহজ।

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। ঢাকা শহরে কোন মৌলিক নার্সারি নাই। সবাই প্রায় গ্রাম থেকে চাষাবাদ করে নিয়ে আসে। হয় গাজিপুর পার হয়ে যেতে হবে অথবা যশোরের দিকে। বা আরো দূরে। কারো ব্যক্তিগত বাগানে থাকতে পারে, তবে তা আরেক ব্যক্তির পক্ষে পাওয়া দৈবাৎ ছাড়া হয় না।

হাটাহাটিও করে দেখলাম। সম্ভব না। তারচেয়ে দোকানে দোকানে লিপস্টিক খোঁজা সহজ।

কিন্তু এত খুঁজে পাইতে আমার যে শ্রম, তার বিনিময় বলে কি আছে?

বিনিময় তো পাচ্ছো, পাচ্ছো না?

তখন মনে হয়, তাইতো, পাচ্ছি তো! একটু লজ্জা পাই আমি। না, না, ঠিকাছে বলে ওকে অন্য কথার দিকে নিয়ে যাই।

এক রমজানে পনেরো রোজার পর একদিন ওকে বললাম, চল, তোমাদের স্টারের লেগরোষ্ট খাওয়াই। জিনিসটা কি তা তখনো ওর কাছে তেমন ক্লীয়ার না। তবুও ঠিক হল পরদিন যাব ওদের বাসায়। বাসায় ও আর ছেলে মেয়ে। বিকাল হবার আগেই লেগরোষ্ট নিয়ে সিএনজি চড়া। অলির পর গলি গিয়ে গিয়ে খুঁজে বের করি বাসা। ফোনে জেনে নিচ্ছিলাম লোকেশন। বাসার গেটে গিয়ে দেখি একা মিষ্টি স্মার্ট স্কার্ট লম্বাটে খুকি দাঁড়িয়ে আছে। স্মিত একটা হাসি দিল, যেন আমি কত আপন আংকেল এসেছে বেড়াতে। তিন তলায় দরজা আবজানো ছিল, খুলেই একটা ফার্নিচারময় ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়ি। বাসার বাইরের উজ্জ্বলতার চাইতে ভিতরটা বেশি ঝকঝকে। ঠাসা জিনিসপত্র। নানান সৌখিন দ্রব্যাদি, গোল বেসিন, বড়সড় সোফা রাখার পর নড়াচড়ার জায়গা কম। তবু সবাই খুব আন্তরিক। চা টা খাবার পর পাশের ছোট রুমে বসলাম সবাই। বালিকা হারমোনিয়াম দিয়ে আনুশেহ'র কয়েকটা গান অদ্ভুত সুন্দর ম্যাচিওর হাস্কি গলায় গাইল। বুঝলাম এই গাওয়া নিয়া ওদের কিছুটা সমবেত গর্ব আছে। আরো কয়েকটা গাইতে বলায় রবীন্দ্রনাথের গান গাইল। কথা বলা আর থামছে না। আমরা কথা বলেই যাচ্ছিলাম। আসলে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। কতদিন ধরে শে গল্প করেছে এই ঘরের, এই চেয়ার

টেবিলের, ছোট বিছানার। এই ঘরেই শে তার বরের সাথে মিলিত হয়। বিস্তৃত ভাবে বলেছে কিভাবে শে আরাম পায় বেশি। কিভাবে অধিক সংগমের রাতগুলি কাটে। কোথায় সিগারেট খায়। ফ্ল্যাটময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর আমি মার্কেজের উপন্যাস পড়ার আনন্দ পাচ্ছিলাম। গোয়েন্দার মত শুঁকে শুঁকে দেখছিলাম। ওকে ডিকন্সট্রাক্ট করছিলাম। আসলে ছিলতো ফোনের ভিতরে কথা বলাতেই স্পেস। রিয়েল। আজ এই যে বাস্তবে দেখা হল, এইটাকে মনে হচ্ছে আনরিয়াল। জানিতো, এইটা থাকবে না। এইটা যে স্মৃতি তৈরি করছে, তা মুছে যাবে। এটলিস্ট তা প্রকাশ্য হবে না। কেউ তা চাইনা।

ওর কন্যাটা খুব সপ্রতিভ। কিন্তু চুপচাপ, আত্মমগ্ন। মাথা নিচু করে থাকতে চায়। ওর হাতে একটা খাতা। পেন্সিলে কবিতা লেখে। লেখে আর লাইন ঠিক করে। পেন্সিলের রাবারটা ক্ষয় করে ফেলেছে। অনেক লাইন অর্ধেক মুছে ফেলা। ছন্দ মিলানো, সরাসরি অর্থ হয় না কিন্তু অর্থবোধক। নিজের মা ছাড়া আর কাউকে মা বলি না আমি। বিশেষ করে সন্তানস্থানীয় কাউকে। তাকে কেন মা বলবো। তার সাথে তো মায়া বা স্নেহমূলক বন্ধুত্ব হতে পারে। কম ঝগড়ার বন্ধুত্ব। বেশি ছাড় দেবার। মা-তো স্পর্শ নেবার। বালিকাদের মাথাও স্পর্শ করতে চাই না এই ভুলবুঝাবুঝির কালে, তাই মা ডাকতে চাই না। তাকে বলি, তুমি ছায়ানটে গান শেখ না কেন। ছায়ানটতো একটা লাইফস্টাইলও শেখায়। এই স্টাইল ঢাকা শহরের কালচারে অপরিহার্য একটা উপাদান। বড় হয়ে তুমি তা ত্যাগ করতে পারবে।

তার মা তখন একবার আলাদা করে আমারে জিগায়: এটা কি বললা। মেয়ে তো ছোট।

আমি বলি, ছোটদের মিথ না শুধু, পরিনামটাও জানাইয়া দেয়া বাঞ্ছনিয়।

নিজেরে খুব ভাল লাগতে দিচ্ছিলাম না।

রূপার দিকে খেয়াল করলাম, দেখলাম সেখানে তিন রকম রূপ। ফোনে কথা বলার সময় একরকম, টেক্সট রচনায় আরেক রকম। আর এই যে আজকে এরকম মুখোমুখি, তা অনেক অন্য রকম। তবে এইটা সবচে ক্ষণস্থায়ী। তাই বুঝি সাব এটোমিক পার্টিক্যাল এর মত মুক্ত, আর জোরালো। লেজার দিয়ে গোপনে ব্যথাহীন বেদনা দিয়ে নকশা কেটে রাখছিলাম মনের ভিতর। ফেরার পথে মনে হল, এই যে যোগ, এইটা কোথাও লেখা রইল।

আসলে ওর সাথে এত কাছাকাছি থেকে এত ছোটছোট কর্মকাণ্ড, নড়াচড়া আর কখনো হয় নাই এতো সময় ধরে। চাপহীন একটা সাবসংসার যেন অন্য একটা টাইম ডাইমেনসনে ঘটছিল। রিয়েল কার্যকারণ পূর্বাপর সহ। মানে যেন সকাল থেকেই দিনটা শুরু হয়েছে। বা গতকাল থেকে শুরু হয়েছে এইসব। যখন স্টার কাবাবের দোকানের লোকটা গতকাল একটা ল্যাম্ব লেগ বা ভেড়ার রান তৈরি করছিল পশুটাকে হত্যা করে... তারপর থেকে ধারাবাহিক ভাবে যা যা ঘটনা ঘটতে পারে তা ঘটে ছিল...। তখন রাত হয়েছে, তারপর সকাল, তারপর পূর্বাহ্ন, দুপুর... তারপর অপরাহ্ন এসে ঢুকে পড়েছে এই বাসাটার মধ্যে। এখানে একটা মহাজাগতিক ঘটনা ঘটছে... বা ঘটেই ছিল, ঘটনাটার দৃশ্য খুলে যাচ্ছে। ঘটনাটা ছোট একবিন্দু হয়ে ছিল, তা সময়-কুড়ি থেকে ঘটনাফুল ফোটার মত ফুটে উঠছে।

ফেরার সময় নিজের বাসার কাছাকাছি এসে কয়েকটা টাকা তুলি এটিএম বুথ থেকে। তখনই মনে হয়, আচ্ছা, আজকের দিনটাও কি আমি ভবিষ্যত থেকে খরচ করলাম না তো? ক্রেডিট কার্ডে খরচ করার মত। একদিন সুদে আসলে ফেরত চাইবে। সেদিন যদি খুব রীচ না থাকি?।

আবার মনে হল, খুব বেশি তো নিলাম না। ঈশ্বরের মত অন্তরীক্ষ্য থেকে একটা চোখ আমাকে দ্যাখে। আরেকটা প্যারালাল জগতে।

হাতে ক্ষমতা থাকলে সক্রেটিসরে আবার মৃত্যদণ্ড দিতাম। ব্যাটা বেশি বেশি প্রশ্ন করে। দুনিয়ায় সবচে বেশি দরকার ক্ষমতা+টাকা পয়সা। টাকার জন্য বেশি প্রশ্ন করতে নাই। তবে উত্তর জানতে হয় অনেক। প্রশ্ন করার আগেই উত্তর জোগাতে হয় মন চাওয়া। তাহলে তুমি আগাইয়া থাকবা।

ক্ষমতার মধ্যে হেমলক আছে। সক্রেটিসরে ক্ষমতাময় করে দাও, তাকে আর হেমলক খাওয়াইতে হবে না। মানবতা তোমাকে কোনদিন প্রশ্নও করবে না।

হেমলকের আটটা পাতা মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ু ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ঠ। আটটা পাতা। আটটা পাতা। চিবাও বা পানিয় বানাও।

।৯।

রুপার সাথে আমার বিভিন্ন ভাবে দেহমিলন হয়।

২৬ মার্চ—প্রথম দেখা—বেকারি তে। ম্যাসেজ দিল: ‘তোমায় দেব পেখম খোলা নীল ময়ুরীর রাত, জোছনা মাতাল করা নক্ষত্র ভরা রাতের গভীরে এক রাত। ছেড়া ছেড়া মেঘগুলো রাতে ফোটা ফুলগুলো সঙ্গী হবে সারা রাত’ (টেক্সট ম্যাসেজ)

মনে হল তার সাথে দেহমিলনের দিনগুলি লিখে রাখি। বর্ণনাগুলি একদিন জেগে উঠবে স্মৃতিভাণ্ডার থেকে।

একদিন এপ্রিল মাসের বিকাল ৩টার দিকে লাঞ্চ শেষে পিসির সামনে বসে একটা প্রোপোজাল লিখছিল, তখন টেক্সট ম্যাসেজ আসে -

ঘাসফড়িং হোয়াট আর ইউ ডুয়িং
—প্রজাপতি (নকিয়া টেক্সট ম্যাসেজ)

একটা অচেনা নম্বর থেকে এসেছে। কিছু না ভেবে আবার কাজে মন দেই।
কিন্তু পরের দিন ঠিক সেই সময়েই আবার টেক্সট আসে। মিলিয়ে দেখে আগের নম্বর। কিন্তু এবার সরাসরি কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মত: নতুন বন্ধুটি কি করে?

তারপর ঘনঘন মিষ্টি মিষ্টি সংশ্লিষ্টতা জ্ঞাপন করা শুরু করল। কয়েক দিনের মধ্যে নাম জানা হলো তার। সাথে জানতে পারলাম শে দুই সন্তানের গর্বিত মা।

কিন্তু তারপর দিনগুলি দ্রুত যেতে লাগলো। মাস খানেকের মধ্যে অবয়ব পরিষ্কার হয়ে গেল, কিন্তু খুবই চুম্বক। চুম্বকটা হল, এই বস্তুটার কোন আড়াল নাই যেন। বুঝতে পারলাম বেশ ৭০/৮০ ভাগ সত্য তথ্য দিয়ে ২০/৩০ ভাগ অন্য রকমের স্বাদযুক্ত উদ্দেশ্যমূলক তথ্য। তাতে মেশানো রাসায়নিক ড্রাগ। যা দ্রুত কাজ করে।

সারাদিন মগ্ন থাকে চলতি হিন্দি সিনেমার গান ও তৎসংশ্লীষ্ট নায়ক নায়িকাদের নিয়ে। সেখানে আসু সে নিদ। সিনেমা রস দিয়া নিজেকে একটা রসালো নারী হিসাবে উপস্থাপন করে শে। আর সেখানে অনেক ইশারা ও ইঙ্গিত কাজ করে।

টেক্সটগুলি দিনে দিনে অপূর্ব কাব্যিক হতে শুরু করলে, বুঝা যায় নানা রকম অনলাইন সার্ভিস থেকে শে এগুলি পাচ্ছে তার নানা রকম প্রেমিকদের কাছ থেকে।

কিন্তু একটা বিষয় বুঝা গেল, শে খুব হালকা নয়। কান কথা, নিন্দা বা কুৎসা শে করে না। শুধু একজন ভূতপূর্ব স্বামী ও কয়েকজন অতি তীব্র প্রেমিকের উপর তার অতি রাগ।

জন্মদিন পালন

আগের দিন বললো: দেখা করবে। বিকালে তাকে মিরপুর রোডে সিএনজি থেকে রিসিভ করে কাছেই জার্মান কালচালার সেন্টারের ছাদ রেস্তোরায় বসে কফি পান করলাম। সে খুব সাদা শাড়ী কালো পাড় পড়ে বেশ অভিজাত হয়ে এসেছিল। দফায় দফায় কফিপান ও লেকপাড়ে

হাটাহাটি আর গিফট গ্রহণ করলাম। তাতে একটা গোলাপ ফুল ছিল। বাসায় ফেরার সময় একটা বাসার পাশের বাগানে ফেলে দিলাম। কেউ জানবে না এখানে নির্জনে একটা ফেইক ফুলটি পড়ে আছে।

জানুয়ারি—বাসায় আগমন। চুমা আর টুমা। ডীপ ফ্রেন্চ। কয়েকদফা।

ফেব্রুয়ারী—রিকশ যমুনা ব্যাংক, ধানমন্ডি, রোড ৬। ফেরার পথে ৮নং ব্রীজের উপর থাকতেই গোলাগুলির শব্দ। বিডিআর এর দিক থেকে। মনে হয় ওদের কোনো ড্রিল হচ্ছে।

বাসায় ফিরে গভীর চুমু। ভালোবাসার আলিঙ্গন। ঘামতে ঘামতে প্রথম মিলন। ত্বকের নিচে বয়ে যায় পাগলামীর স্রোত।

১২.৩০ এ বাসা থেকে বের হওয়া। ঘামতে ঘামতে দুজনেই নেয়ে উঠছি। শে বলল, থাক, ঘামটা গায়েই থাক।

আবাহনি মাঠের পশ্চিম পাশে পেয়ারা বেচছিল এক ভ্যানঅলা, আধা কেজি কিনল শে। এতকিছুর পর কী ঠাণ্ডা মাথায় বলল: মাপ ঠিক করে দিও।

পাশ দিয়ে মাথা থেকে রক্ত ঝরছে এক লোক, রিকশায়, দ্রুত চলে গেল।

বিডিআরে গোলাগুলি হৈছে, অনেক মানুষ মারা গেছে, সাবধান। শহর গরম। সাতমসজিদ রোডে ট্যাংক। কি উঁচুরে বাবা। কামানগুলির মুখ দক্ষিণ মুখী।

পরদিন শোনা গেল ৫৭জন অফিসাররে মাইরা ফেলছে।

মে—রেস্তোরাঁয় দেখা

১৬—গ্রেট ডে—পুরাটাই আবার, জার্নি—উথাল পাথাল মাল্টি কালার, ২ গেম। শি ওয়াজ সো হর্ণি এন্ড একটিভ যে কি বলব। এইটা একটা পারফেক্ট মিলন। একই সাথে আধ্যাত্মিক ও আত্মার মিলন। দুজনই দুজনকে এতটা ডাইল্যুট করতে পারে। যেন দুজনের আদ্যারস নি:সরণে গলে গলে যাচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন বরফ, আর ধারা হয়ে শরীরের মধ্যদেশ থেকে যাত্রা করে তা হার্ট ভরিয়ে দিয়ে গলা শুকিয়ে কপাল থেকে মাথার পিছনটা পর্যন্ত ডোপামিনে চুবিয়ে দিয়েছিল। তার ঘ্রাণ বাছাইকরা আখের রসের মদ গন্ধের চেয়েও মিষ্টি।

৩০—দারুন জটিল সে নদী—দেখা হল নানা ভাবে, নিজে ও অপরে। দারুন সব গল্পাংশ। হলুদ শরিষাফুলের বিছানায়। ও এতো সক্রিয় ছিল যে কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।

মনে হৈল ভাওয়াইয়া গান বাজতেছে কোথাও: ‘দেওয়া করিছে মেঘমেঘালী, টলাল পূবাল বাও...ধীরে কেনে বাওয়ান তরী রে’

১৮—জার্নি বাই বোট—হাওয়ায় নদীতে উড়ে উড়ে—ভেসে ভেসে—যদিও নদীতে ঢেউ নাই, আকাশে বাতাস নাই।

বিকালে রিকশায় তুলে নিলাম। বসিলা নির্মিয়মান ব্রীজের নিচ থেকে নৌকা। পাটি বিছানো বৈঠা নাও। নামলো কামরাঙ্গির চরে। সন্ধ্যা হয় হয়। আবার রিকসা, নবাবগন্জের পথ আর শেষ হয়না। ও মাথায় দিয়েছে ওড়নার ঘোমটা, যেন নতুন বউ ওর। পালিয়ে এসে বাসা নিয়েছে কামরাঙ্গির চরে গোপনে।

সেপটেম্বর ৮ অন লাভ গেম—ঈদের সালামী নাও।

একটা শো হে বেলুন, চলো ঢুকি। দেখি তুমিই আগে ঢুকাও।

অক্টোবর ২২—সর্মা হাউজে দেখা—একমাস পর একঘন্টা। বসে ছিল, প্রতীক্ষা। কফি না চা? কালো নেটের কামিজ, ৩কোয়ার্টার হাতা—গর্জিয়াস দেখাচ্ছিল

জানুয়ারি—পিঠার দোকানে ৫ মিনিট

ফেবুয়ারি—কফি খায়

এপ্রিল—এসেছিলে তবু আসো নাই—আসি না আসি করে ৯ মাস পর এল। কাঁদতে কাঁদতে এলো, গেলোও চোখের পানি দেখিয়ে। ফেরৎ দিলো ঈদের টাকাটা। বললো, তুমি আমাকে যা ভাবো আমি তা নই। আর কানছিলো, অঝোরে আর কত যে ব্যাথার কথা… ২ বছর ধরে প্রাক্তন এর সাথে নতুন ভাবের জ্বালা এখন পোহাতে হচ্ছে.. মানে নানান রকম আবোল তাবোল বলে মন ভিজানো। আসলে আমি তো ধরে ফেলেছি, ও একটা সুযোগ চোর। কিন্তু কেন এসব করে তা তো জানা হল না। ওযে হোর না তা বুঝা গেল। তা না হলে এতদিন পরে টাকাটা ফেরৎ দিত না। আবার হোর না তাও বুঝা গেল না, না হলে সেদিন টাকাটা নিলই বা কেন!

আগষ্ট ৫—আপাতত বিদায়। মিস দিলাম। নো রিপ্লাই

সেপটেম্বর ৩—দীর্ঘদিন আউট অব কন্টাক্ট। হঠাৎ একটা মেসেজ দিলে বলে, তখন গভীর রাত, বাসে করে কক্সবাজার যাচ্ছে। তারপর তার সাথে এই রকম টেক্সট লেনদেন হয়, বেশির ভাগই ওর করা:

রাত ১.৩৭ ওই হারামজাদা তুই এত জ্বালাস কেনো?

১.৪১ তুমি আমার কাছে কি চাও (আমি বলি: তুমি কি চাও)

১.৫৬ তোর পুটকি মারতে চাই (আমি: পুটকি মারতে কামলা পাঠামু?)

২.১০ হ্যা তোর মত একটা কামলা লাগবো

২.১২ তোর ভাগ্য ভাল না খারাপ জানিনা, তবে তুই প্রথম! বুড্ডা পুটকি আমি মারিনা! আমি যাদের পারছি সব ফ্রেস! বুঝলা চান্দু!

২.২০ তবু মন চির সবুজ থাকব

২.২৪ এবার গ্রামে গিয়ে সবুজের খনি পেয়েছিলাম। নদীতে ভরা যৌবন ছিল। পাড়ে পাটখড়ি ছিল

২.২৬ ওহ ঘাটে গুদারা ছিল। মাঠে আখ ছিল। আখ ভাংতে পারি নাই। এত শক্ত ছিল।

২.২৯ ঠিকই বলেছ, এগুলি আমার পালানোর জায়গা। এটুকু না থাকলে আমি হয়তো বাচতাম না।

২.৩২ তুমি এটা না বল্লে এখন আমার চোখ নদী হত না! (একটা মেসেজ দিয়ে ছিলাম, তাতে তার চোখ পানিতে ভরে গেছিল)।

সেপটেম্বর ৩০—বৃহস্পতিবার হলেই বিবাদ শুরু হয়। ও আসে ছায়ানট। বললাম আসো... উত্তর নাই। নাই তো নাই... ৮টায় টেক্সট দিলাম: ডেটিং কেমন হল? বলল ভাল।
ও বলে: তোমাকে নিয়ে আমি ক্লান্ত
আমি বললাম: আমিও!

নভেম্বর ৭—যব উই মেট

আজ শে আইলো। ৭ মাস পর। অবশেষে, সব ঢং ফাং করে। অনেক দিন পরে। এসেই নানা রকম ভুজুং... তুমি না বলছিলা,আমারে চাও না? বলে সুরসুরায়। এখন কেন কাতুর কুতুর করো? আমার শরীর না, আমার মন চাও বুঝি?

আমিও নানান কবজ দেই: তুমি আইলে আমার সব কেমন উলট পালট হয়। কথা বলব না চুমা খাইব না তোমারে চোখ দিয়া দেখব? মনে হয়ে সময় নাই, সময় নাই! তোমার গায়ে অপরিচিতের ঘ্রাণ। যেন বাদাম বেটে ত্বকে লাগিয়েছো।

তোমাকে ধুয়ে মুছে তোমার হরমোনের গন্ধ ফেরত আনা প্রয়োজন।

প্রথমে শাওয়ারে গোসল করে পবিত্র হয়ে নিলাম। তারপর অনেকক্ষণ বাথটাবে ফেনায় ঢেকে রাখলাম রূপাকে। এমনিতে তার ত্বক মসৃণ। কোন দাগ নাই সারা শরীরে। কোন আচর, কামড়ের দাগ বা ছোট বেলার কাট মার্ক নাই। পরিষ্কার হালকা কাপড় পড়ে নিলাম। কোন পারফিউম লাগলো না, এমনই সুঘ্রাণ পাইলাম ওর শরীরে। ওকে বসালাম সিঙ্গেল সোফায় উত্তরমুখি করে। হাত দুটা হাতলের উপর রাখতে বললাম। মেঝেতে কার্পেট পাতা। মেঝেতে হাটু গেড়ে বসলাম রূপার পা থেকে একটু স্পেস রেখে। সিজদায় যাবার মতো করে ঝুঁকে পা দুটাকে দুহাতে একসাথে ধরে চুমু খেলাম। পরম আদরে ফুট ম্যাসেজ করতে লাগলাম। আমার হাতের চাপে রূপা টের পেল ভালবাসা আর পুজা কাকে বলে। ওর চমক লাগছিল প্রথম থেকেই। এবার বিস্ময়ের সাথে শিহরণ জাগলো শরীরে। মনে হল, একি! কোনদিন তো এরকম করে শুরু হয় নাই কোন পূর্বকাম।

তোমার শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে ইলিশের লাল মাংশের আঘ্রাণ। সেখানে শিউলি পাপড়ি। যেন তোমাকে খেলে শরীরের অষুখ ছেড়ে যাবে।

যখন আসো একসাথে কত লোভ সামাল দিতে হয়! খাইবো না জড়ায়ে ধরে স্পর্শ নেবো? সামনে যা আসে তাতেই সাড়া দেই। তাইতো শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে আবার তাকে পাই। জোরে জোরে জোরে জারিয়ে যেতে থাকি। হোক না জড়োয়া, হোক না মোসামুসি। তুমি বুঝে যাও আমার ভাবনা নিয়া। আমার ভাবনা নিয়া তুমি খেলিছো, আমার বুঝা নিয়া

তুমি নিজে নিজে বুঝিছো। তারপরও কি যে ভাবতেছে এই কথা খুঁজতে খুঁজতে তেরে কেটে তাক, তোমার চোষা তোমার চুষু তোমার চাটা তোমার পোতা খাওয়া আমার পুষু খাওয়া দাওয়া থাক।

ডিসেম্বর ১৩—রহস্যময়—সারারাত তোমার অনেক নাটকী শুনে শুনে দেখলাম।

তুমি তোমার যুবক ভাসুর পুত্র ভাতিজার লাভে পড়ছ। গভীর রাতে গল্প করে করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছ কিছুক্ষণ আগে। তারপর যেই বুকের বোতাম খুলে ওর হাতদুটি তোমার স্তনে নিয়া গেছ আর গভীর চুমা খাইছো কয়েকটা, তখনি সে ঝটকা দিয়া তোমারে ধাক্কা দিয়া ফেলাইয়া দিছে। এর আগে ভাতিজার সাথে বিয়ার খাইছ। এখন হাফ মাতাল হৈয়া ভরভর কৈরা কানতেছ: আর আমারে বলতেছ: যে কথা আমি আমার মা, বাবা, ভাই, বোন, দেবর, জামাই, মেয়ে কাউকেই বলতে পারি না, তা আজ তোমাকে বললাম। তাই আজ থেকে তুমি আমার বিশেষ বন্ধু! চিরকালের বন্ধু। মনে রাইখ। আর হু হু কৈরা কানতেছিলো। আর বললো, এইটা আমি কি করলাম। ও আমার বুকে ঝাপাইয়া পড়ল না কেন? আমারে ফিরাইয়া দিল কেন? মাতাল হয়ে বকবক বকবক...

ভাতিজাটা দেখতে ঠিক ওর তরুন বয়সের জামাইর মত। তবে অনেক স্মার্ট। অনেক উদাসিন। এত বেখায়াল যে, দেখেই বুকটা ধ্বক করে ওঠে। মনে হয় সেই বয়সের না পাওয়া একটা গাছপাকা টুসটুসে পেয়ারা ফল। রাতে বুকে জড়াইয়া ধরতে ইচ্ছা করে তারে, কেউ একজনরে। বুকের ভিতর খুব করে মোচরাইয়া, দলা পাকাইয়া, বাইন্ধা রাখতে চায় মন।

জানুয়ারি—আজকের সাইজ কতো?

দুই মাস ধইরা ব্যায়াম করতেছে, হিন্দি নায়িকা শিল্পা শেঠির দেখানো ইয়োগা আর প্রাণায়াম ইউটিউবে, দৈনিক এক ঘন্টা। তার একটা নাম দিলাম: এমোনিয়া। গাছের সার। ওজন কমাবার পর শুকাইয়া গেলে দেখতে কেমন হবে তা বর্ণনা করে শোনাই। ও অবশ্য রেগে আগুন। আমি বলি, একটু গোলগাল তোমাকে মানায়। তবে চেষ্টা করলেই কি আর ফিরে যেতে পারবে সোনা, সেই ২৭ বছরের তন্বী জীবনে? তোমাকে দেখলে মনে হতো বুকটা হিংসায় ভরে ওঠে গো তোমার সৌন্দর্য্য দেখে। তুমি এতো ঝরঝরা কেমনে ছিলা। আর সেই জীবন ফিরে পাবে না।

আজ—ওজন: ১৫৯ পা. মাপ: ৩৯-৩৪-৩৮
করতে চাও—ওজন: ১৫৪ পা. মাপ: ৩৮-৩২-৩৮

দেখা যাক কয়দিন লাগে। তোমার এতো ধৈর্য তো নাই। সামনে তো তোমার মোটা হবার দিন। হারায়ে যাবার দিন।

সামনে তোমার মাপ হবে ৪২-৪০-৪৪। ওজন হবে ৭৫ কেজি। বুক কোমর নিতম্ব, সব অতিকায় হবার দিকে। মেদালো।

ফেব্রুয়ারিতে বহুদিন পর ফোনাফুনি। বোঝা গেল ভীষণ রাগ। ঢং ঢাং করে যা বোঝাইল, আমার সাথে না, অন্য কোন এক সম্পর্কের কথা। কি তা জানে না। শে চায় না কোন গিফট, যশ, সুনাম আমার কাছ থেকে। বাহ বাহ, মনে হচ্ছে কিছু টাকা ধার চেয়েছিল, না পাইয়া খুব আঘাত পাইছে। স্বামী সোহাগী।

সেপটেম্বর ২৯—আবার শে এলো

আবার সব ভরে দিলো শে। কেন যে এলো? প্রথম বসলো ধানমন্ডি লেকের সাম্পানে। বিকেলটা বসে বসে কয়েক কাপ কফিতে আটকে থাকলো। ৭টার দিকে খালি আপিসে গেলো, লোকশুন্য আপিসে তোমার গল্প শুনলাম। গল্প শুনছি আর হাতাচ্ছি তোমার শরীরে আমার স্মৃতিসমূহ। হাতরে যাচ্ছি আর স্পর্শ পাচ্ছিনা প্রথম দিনের। সেই যে, আড়ংয়ের সামনে দেখা হল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে বলেছিলাম, রিকসায় চড়বে কয়েক মিনিট? তুমি সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলে। রিকসায় উঠে বা দিকে তোমাকে রেখে বা হাতটা দিয়ে তোমারে পিঠের দিকে জড়িয়ে ধরতে দিলে তুমি। কিন্তু অনেকগুলি সেপটিপিন দিয়ে শাড়িটা এমন করে ঢেকে এসেছো যে, হাত দিয়ে তোমার খোলা কোমর খুঁজে পাওয়া গেল না। তুমি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলে। আমিও ভদ্রতা লংঘন করে কিছু বলিনা। আগামী সুযোগের আশায় নিজেকে সুবোধ করে রেখেছিলাম। এ নিয়ে আজকে কথা হলো। দুজনেই খুব হাসাহাসি করলাম। সেদিন দুজনেই তো বুঝেছিলাম, আমরা দুজনেই শেয়ানা ঘুঘু।

বসে বসে তার গল্প শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তুমি বসেই থাকলে। আমি পায়চারি করে আগুপিছু করছি। তুমি চেয়ে আবার একটা সিগারেট খেলে। বুঝলাম তোমার কিছুটা আবেগ আসছে। একটু এগিয়ে গিয়ে হালকা করে একটু চুমু খেলাম। কিন্তু খুব শুকনা। তুমি অনেক জোর করেই যেন চোখদুটা চেপে রেখেছো। একটা গল্পজয়েন্ট ধরালাম। গল্প করতে করতে মনে হল, আমাকে আবার তোমার চাই... তোমাকে একটু কাছে টেনে কিছু শৃঙ্গার করলাম। তুমি আরষ্ট হয়ে আবেগে গ্রগ্রগ্র করে উঠলে। কিন্তু গভীর আলিঙ্গন পর্যন্ত গেলে না। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে আবার চেয়ারে বসে রইলে।

নভেম্বর

অনেকদিন পর দেখা হল। বার্গার খেয়ে বসলাম সেই অফিসে আবার। ঘন্টা খানেক মাত্র। তোমার দেহ বল্লরী কেমন বদলাইয়া গেছে। একটা জোর হাগ হল শুধু। হয়তো এটাই শেষ, এরকম মনে হল।

+

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত...

সকাল-দুপুর-বিকাল-সন্ধ্যা-রাত-গভীর রাত-সারারাত

আনন্দ বেকারি-জার্মান কালচালার-ধানমন্ডি-ছায়ানট-যমুনা ব্যাংক-২৭ নং-আড়ং-চাদনি চক। দেশ-বিদেশ, নাইট কোচে সারারাত দুইটা ফোন দিয়ে লাগাতার টেক্সটিং। জানা হল, ন্যাশনাল হাইওয়ের অনেক খানেই মোবাইল নেটওয়ার্ক থাকেনা। ফেরি, রিসোর্টের সাপখোপ ভরা কটেজের নৈশ লন, হোটেলের এক্সপেন্সিভ ফোন... কতোভাবেই না!

তোমার যে কান দুটা আবিষ্কার করছিলাম সেখানে কিনা আজ অন্য কেউ ফিসফিস করে কথা বলে!

: হা হা হা

সবই তো মনে আছে দেখছি।

তুমি তো কাটপেষ্ট করছো কেবল

কী রকম?

যেভাবে চায়নার মাল বিলাতি স্টিকার লাগাইয়া সাপ্লাই করে

কে চায়না আর কে বিলাত?

ধর তখনকার সময়টা চায়না আর এখনকারটা বিলাত।

কথাটা বলতেই হচ্ছে। যদিও আজকে বন্ধু দিবস। হঠাৎ তোমার অন্ধকার তোমার সবগুলি আলোগুলিকে খেয়ে ফেলেছে। যেহেতু তোমার মনে আর দেহে আমার জন্য কোন কিছু নাই, তাই বাই বাই, টা টা। আমার মাথা আর মন থেকে তোমার সব ডাটা ও আবেগ মুছে দিছি। এরপর থেকে তোমার সাথে আমার আর আগেকার যোগাযোগগুলি আপডেট হবেনা। ইনবক্স এখনি বন্ধ করব না, তবে তাতে কোন প্রশ্ন-উত্তর হবে না। মতামত রাখতে পার, তবে না রাখলেও কথাগুলি প্রযোজ্য থাকবে। বিশ্ব সম্পর্কে আগ্রহ বাড়াইতে থাক। বেড়ে ওঠা খুবই সুখবর। স্বাস্থ্যকর। ভবিষ্যত ভাল।

+

একদিন সত্যি সত্যি রূপার মুখের নানা জায়গা থেকে গাছের শিকড় আর ডালপালা বেরনো শুরু করল। জামাটা বড় হয়, মানুষটা একই থাকে।

+

বলা যায় নীতি হিসাবে আমার পছন্দ হচ্ছে: কাউকে শিখাই না, বিচার করি না, শাস্তি আর পুরষ্কার সাথে সাথে দিয়ে দেই। বলতে পারো, একপাত্রে দুই রকম খাবার হয়ে গেল না? বিচার না করলে শাস্তি হয় কিরূপে? কেন অপরাধ ছাড়া জেল হতে পারে না?

ধরো, কাউকে তোমার সহ্য হচ্ছে না, তাকে ধরে তো তুমি জেরা করতে পারছো না... কেন করবে? জেরার ভিতরে তোমাকে ওর ভিতরে ঢুকতে হচ্ছে, ও না চাইলেও এই কাজটা কখনো কখনো নোংরা মনে হতে পারে।

উত্তর-উদ্বাস্তু আমরা। কুত্তা-বান্দরের মত থাকি। আরে ভাই আমরা তো আর প্রতিদিন একটা করে ডালিম আর কেশর দেয়া একগ্লাশ দুধ আর ডিম খাইনা। আমাদের ভিতর গ্লো আসবে কি করে?

ভ্যালেন্টাইন ডের সাথে আছে স্বৈরাচার হঠাও দিবস।

রূপার নাম দিলাম ‘কাটপেষ্ট’। ও খালি অভিজ্ঞতা কুড়ায় আর তা থেকে কয়েকটা রেখে দেয়। তারপর সময় সুযোগে তার একটা একটা করে ব্যবহার করে।

নিজের ব্র্যান্ডের বাইরে সিগারেট টানলে মনে হয় অনুবাদ কবিতা। মনে হয় জীবনে কিছু অভিসাপ সঞ্চয় করাটাও দরকার।

ডু নট এলাউ মি টু ফরগেট ইউ।

++

আমাদের ফ্যান্টাসি ছিল একটা শিশুকে সারোগেট নেয়া নিয়া। ও গর্ব করে বলল: আমি হচ্ছি সুপার উর্বরা। বীজ পরলেই সুন্দর ফসল দিতে পারি। দেখ, আমার পেটে কোন কাটা দাগ নাই। কোন ভাজ নাই। আমার কোন ঝামেলা হয় নাই জন্ম দিতে। আরো পারতাম। অনেক শিশু আমার স্বপ্ন।

ঠিকাছে, একবার আমার জন্য দাও একটা বছর। পারবা না?

হবে হবে। সেদিন তার ৩২ বছর বয়েস।

তবে খরচ পাতি আছে কিন্তু।

কতো?

মেলা খরচ। ৯মাস বাছা বাছা খাবার লাগবে। আঙুর বেদানা,বাদাম, কবুতরের স্যুপ। শোবার ঘরটা সাজাইতে হবে, এসি করতে হবে। ভাল একটা কুক-কাম-বুয়া লাগবে। কয়েক বার সুন্দর জায়গায় বেড়াতে নিয়া যাইতে হবে। অবশ্যই এয়ারে। আর দেশে হলে দামী কোন গাড়িতে। মনটা আমিরি রাখতে যা যা লাগে।

আঙুর বেদানা কেন?

বাচ্চার গায়ের রং পরিষ্কার হবে। স্বাস্থ্যবান হবে। বাদামে বুদ্ধি হবে।

তাহলে তোমার তো পূরা সময়টা অংক করতে হবে। পাজল মিলাতে হবে। আর ভায়োলিন শুনতে হবে। শুনেছি হবু ইহুদি মায়েরা তেমন করে। বাচ্চাটা বুদ্ধি শানাইয়া আসবে পেটের ভিতর থেকেই। দরদি হবে, গভীর অনুভূতি হবে।

খরচ কেমন হবে বলে মনে হয়?

৮ থেকে ১০ লাখ। তারপর আমার পোষানি আছে না? টাইমের মজুরি?

মনটা দমে গেল। এত খরচ করে যদি বাচ্চাটা আমার রূপ আর তার বুদ্ধি পায়, তাইলেই হৈছে। একটা কামুক-অবিশ্বাসি-এভারেজ দেখতে অতি চালাক বাচ্চাকে নিয়া কি করবো? প্রজেক্ট বেশি দূর আগাইলো না, তবে তার ফ্যান্টাসিটা রয়ে গেল।

একদিন ক্যাপ ছাড়া মিলনের সময় বললাম, কি, আজ বীজ বুনে দিবো নাকি?

ও বলল, চেকটা দাও আগে!

তখন কয়েকদিন মাসে দুইতিন বার আমাদের দেখা হত।

)(

একদিন তোমার নগ্ন শরীর দেখে ভেবেছিলাম, তোমাকে দেখা শেষ হৈল। কিন্তু তখন তোমার মন দেখতে পারি নাই। আজ এত বছর পর যখন তোমার শরীর কাপড় চোপরে ঢাকা, তুমি আড়ালে, তখন দেখলাম মন! নগ্ন মন! কতই না আলাদা !

শরীর শরীর আর শরীর। তোমার কি মন নাই, ঢাকা?

: কোন কথা নাই
কার সাথে কার?
: কারো সাথেই কারো
ভালতো
: হুম
সবাই সবাইকে ভুলে যাচ্ছে
: ইশ... শহরের সবাই যদি সবাইকে ভুলে যেত!

তোমার জন্য একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছে

তুমি বললে: ওকে আমার চাই, যখন আমি বুড়ি হবো, চামড়া ঝুইলা যাবে,

তখনো যাতে ও আমাকে ভালবাসে... সেটা ওর মুখ থেকে শুনতে চাই। একটা বাচ্চা প্রেমিক চাই।

... তখন তোমার চোখ উন্মাদীনি দেখাচ্ছিল...জংগি...

।১০।

রবীন্দ্রনাথ

রবিঠাকুর আমার কৈশোরের সারা সংসারে জড়াইয়া আছে। সেখানে মৃণালীনি দেবী আছেন, আছেন রবি নিজে। সর্বোপরি মাথার উপর জ্বলজ্বল করছেন বৌদি। বৌদি এসে আমাদের মধ্যে রোপন করে দিছিল শেষের কবিতা বইটা আর লাবণ্যকে। লাবণ্য ছিল আমাদের ধ্যাণজ্ঞান প্রভারূপ প্রতিভা।

একটা ত্রিমুখী গল্প জীবনে যেন লাগেই। নষ্টনীড় গল্পটা সিনেমা দেখে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, তুমি আমার দেবর হও! আমি তো সেদিন হতবাক! শে আমাকে পাশ থেকে জোরে চিমটি কেটে ধরে থাকল। আমিতো ব্যথা পাবো না বিস্মিত হবো ভেবেই পাচ্ছিলাম না। পরে আমাকে বুঝাইছিল, সে মুহূর্তে ও ছিল হৃদয়াবেগে কুলভাসানো নারী। আমাকে দেখে আর আমার কথা শুনে তার ভিতরে কি যে হলো, তা সে নিজেই জানে না। মনে হচ্ছিলো শে ডুবে যাচ্ছে চোরাবালিতে। ডুবে যাচ্ছে, বাঁচানোর কেউ নাই এমন সময় সেখানে নাকি ছিলাম খুব কাছেই, আমি। তাই শে প্রাণপণে আমাকে ছুঁয়ে থাকতে চাচ্ছিল।

পোষ্টমডার্ন কালের ধুসরতার ভিতর আমি চমকাইলাম। যেন আমার ভিতর কোলাহল উপনিত হৈল।

বিকাম, বিতৃষ্ণা

অনেক দিন পর ভাবলো: প্রথম লোকটা, যাকে ও শৈশবে বিয়ে করেছিল, কিন্তু সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। শুধু সম্পর্ক না, ওর প্রাক যৌবনকে তছনছ করে দিয়ে গেছিল। সারাজীবনের মত মুচরে দিয়ে গেছে মনটাকে। আজো যা শে মেরামতের চেষ্টা করে যাচ্ছে। তার কথা ভাবলো।

লোকটাকে কখনোই ক্ষমা করতে পারে নাই। কিন্তু সে লেগে আছে প্রাণপণ। আজকে স্বীকার করল, এখন যা করে সবই ওকে দেখানোর জন্য। ফ্ল্যাট বানায়া বৈসা আছে। কবে নিবা বল।
রূপা বলে: লিখে দিতে হবে কিন্তু।
সে বলে: চল একদিন, কোনটা পছন্দ হয় দেখাইয়া দেও।
রূপা বলে: দেখতে হবে না। তুমি শুধু তোমার বৌরে জানাইয়া দিবা। পারবা?
:: আরে নাহ। সম্ভব না। সংসার নরক বানাইয়া ফেলবে। এমনিতেই তার কিছু একটা ভাল না লাগলেই বলবে, হ, মন খরব কেন, মন তো আগেরটার কাছেই এখনো বান্ধা!
রূপা বোঝে, লোকটা চেষ্টা চালাইয়াই যাচ্ছে, ওর মনটা গলাইতে।

: শুয়ারটা আমার জীবনের সেরাটা পাইছিল। আমার প্রথম কুমারী মন। আমার শরীরটা তখন একদম পরীর মত। সেই শরীরটাকেও সে ভালবাসতে পারে নাই।

- ভালবাসা কি?
- কইতরের হাড্ডি। চিবাইতে খুব মজা
- তুমি তো পাও নাই, তাই চিবাইতে চাও।

- ভালবাসারে চাটাও যায়, জানো নাকি?

ও ভ্রুকুচকাইয়া, গম্ভীর হৈয়া, তারপর ঘাড় বাকাইয়া কাঁধটারে ঝাঁকি দিয়া কয়

- কইছে! ওইটা ভালবাসা না। ঐটা চাটা পর্যন্তই!

- তাইলে কি?

তখন শে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। একদিকের গালটাকে একটু উঠিয়ে সেই কোনাটা দিয়ে জিভের আগাটা দিয়ে টাগরার সাইডে বারি দিল। কেমন যেন অশালিন শব্দটা। ছোট বেলায় আমরা এরকম করতাম। কিন্তু তা ছিল একটা স্থুল ব্যাপার তখন। এতোদিন পরে একজন সুদর্শনার একগাল থেকে এমন একটা স্বত:স্ফূর্ত ধ্বনি! আমি প্রথমে থমকে গেলেও, গা কিট কিট করলেও, অপূর্ব আনন্দ পাইলাম। মুখশ্রীর সাথে বিপরীত রূপ সংঘর্ষ তৈরি হল যেন।

মনে হল, টাগরার মধ্যে একটা স্বাধীনতা লুকাইয়া রাখছে। সেখানে শে নিজের জগৎটাকে নিয়ে খেলে।....

হঠাৎ এক রাতে একটা দৃশ্য আমাকে বহুদিন পর ভর করল। কবে যেন যাচ্ছি খুব জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে। হালকা বনাঞ্চল, ঘাস ছায়া ছায়ি। সরসর করে কিছু একটা বাতাস পিছু নিছে। আধা ঝোপগুলি পালিয়ে পালিয়ে পাশাপাশি হামাগুড়ি দিচ্ছে।

খালি, একা, নি:সঙ্গ দৃশ্য, যদিও সব কিছু আছে।

এরমধ্যে আমি প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ না বলে ‘হ’ বলা ও লেখা শুরু করি। প্রথমে এটা ছিল ইনবক্সে। এটা আমার ছোট বেলায় শোনা

বিক্রমপুরের লফজ। আমার জন্য সহজাত। তাই বেশ একটা সপ্রতিভতা ছিল। লিখতাম ‘হৈছে’, ‘কৈ’ যাবা—এইরকম ‘কৈরা’। মানে যথসম্ভব ছোট, সহজ উচ্চারণ ভিত্তিক বানান।

দেখ, আমি তোমার কাছে আসছিলাম তোমারে জাগাইয়া তুলতে। এখন চলে যাচ্ছি যাতে তুমি ঘুমিয়ে না পর আমার কোলে। তোমারই তো লাভ হৈল।

নাকি আবার কাউকে জাগাইতে যাচ্ছ?

অনেকটা সেই রকম। একজন আমার ঘুম ভাঙ্গাইতেছে মনে হয়। আমি জেগে উঠছি। জীবনের প্রথম টের পাইতেছি।

কিশোরী বেলা? যেটা ছোট বেলায় পাও নাই!
আমার সবই প্রথম। কেন তুমি আমারে পাও নাই? এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?

অদ্ভুত তোমার বেঁচে থাকার ইচ্ছা।
বারবার মরতে চেয়ে তা কর তুমি!
মরতে চাইলাম কখন?
যতবার তুমি কান্দো!

গরু ছাগল মাছ মুরগি কেউই প্রাকৃতিক ভাবে ভুট্টা খায় না। ভুট্টা নিজেও ভুট্টা না। সে মানুষের লোভের বলি। মানুষ তাকে যত্ন করে সার পানি দিয়ে মোটা করে তো তাতে হয় কি, এইসব প্রাণীর ভুট্টা হজমের প্রক্রিয়ার মাজখানে জন্ম নেয় নতুন ধরনের ব্যাকটেরিয়া। এই

ব্যাকটেরিয়ার বেশ কিছু রয়ে যায় পরে বার্গার, হটডগ ইত্যাদির ভেতর। মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারে না, এ হলো সেই ব্যাকটেরিয়ার কাজ।

একটা মেয়ে পিরিয়ডকালীন প্যাডের পিক নিয়া ফেসবুকে দিল। দেখেই খুব স্বাধীন লাগছিল। এইরকম কিছু করার জন্য মনটা আকুপাকু করতেছিল। শে করছে। চারিদিকে নানা রকম সমালোচনা হচ্ছে। তবে সবচে ভাল লাগল, কেউ কেউ জিজ্ঞেস করছে, পিরিয়ডের পর মেয়েটা কি করবে? মানে এই মহামূল্যবান কর্মটি করার পরের ধাপ তো হল, গর্ভধারণ। তাহলেই তো স্রষ্টার ইচ্ছাপূরণ হয়। প্রতিটি নারী যদি মোটামুটি ৪০০টা ডিমের সম্ভাবনা নিয়া জন্মায় সারাজীবনে, তাহলে তো তার খুব হিসাব নিকাশ করেই এর সমাদর করা উচিৎ! তরুণি কি তা ধর্তব্যে নিবে? নাকি শে তার নারীত্বের এই চিহ্নটাকে নিতান্ত আত্মপ্রচারণার জন্য ব্যবহার করে যাবে?

তুমি তো সেই দেশের মানুষ, যারা এক লাউয়ের জন্য ৫০ জন আহত হয়। গোষ্ঠিবদ্ধ! দলবদ্ধ! গোয়ার দল। বোকা দল। বুদ্ধিমান ম্লান হয়ে যায় বোকার কাছে।

‘এমন অনেক গোপন ইতিহাস আছে যা শুধু দুটি মানুষ জানে অথবা একটা মানুষ হয়তো বা কোনো মানুষই জানে না শুধু প্রকৃতি জানে!’
: কোনদিন ভিতর থেকে সাড়া নিয়া পড়ি নাই। মনে হচ্ছে এখন তা হবে
:: একসময় অচেতন হয়ে করছ, তারপর সচেতন ভাবটা তোমার আনছি আমি। এখন অতিচেতনার ভিতর তুমি। নিজে নিজেই বের হয়ে যাচ্ছ। এরপর তুমি হৃদয়শুন্য হয়ে উঠবে। তুমি শুন্য থেকে সৃষ্টি করতে পারবে।
: সেটা কীরকম?

:: এখন বুঝাতে পারব না। মনে কর, আমি এখন সেই রকম। রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি যদি পথ খুঁজে খুঁজে সেই পথে আসো, তখন দেখা হলে বুঝিয়ে দেব।

শুনেছি খোলা চোখে চুমু খেলে নাকি চুমু'র স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমি তো সারাজীবন লজ্জার ভান করে চোখ বন্ধ করেই চুমু খাইলাম, কই তেমন স্বাদ তো পাই নাই। তোমার সাথে তাই তো খোলা চোখে চুমু খেলাম। আর তারপর যে অভিজ্ঞতা পাইলাম, তাতেই তো যেন আমার নতুন চোখ খুলে গেল। তুমি আমারে নতুন দিনের দরজাগুলি দেখাইয়া দিলা। নিজের হাতে যত্ন করে খুলে দিলা, তা কি আর মনে থাকল না? তোমাকে দেখেই বুঝলাম, মানুষের কত চোখের তৃষ্ণা থাকতে পারে। এক পৃথিবী সমান। চোখ দিয়ে নয় শুধু, তুমি দেখ আঙুল দিয়ে, নাক দিয়ে, তোমার অপুষ্ট বাইসেপ দিয়ে, জিহবা দিয়ে।

বরং বল, আমি দেখি আত্মা দিয়ে। কোর অনুভূতিসমগ্র দিয়ে।

সেটাই তো বলতেছি। তুমি আমার জ্ঞান নিয়া কাজ করছ। আমার আগুন নিয়া না। আমি তো নিভানো। আমারে জাগাইত শরীর। ঐটা হয়তো আমার একটা অসুখ। অতি কাম। তোমার কাছেই বুঝলাম, যে আমার মিটার নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে একটা আলাদা বিরাট জগৎ খুলে যাবে। আমি সেটার মধ্যেই পড়তে চাইলাম। তোমার কাছে সেই অনুপস্থিত টাকে শিখলাম!

আরেকবার তোমার হুজুর কি এক সংকটে দেশ থেকে এক পীর সাহেবকে বাসায় এনে রাখছিল। তার সাথে সারা রাত বসে জিকির করত। তখনো তুমি এখনকার মত একটা সেল্ফ মৌনব্রত করছিলা...

কল্পনা আর স্বপ্ন

তুমি যখন কাউকে নিয়ে তেপান্তরে ঘর বাঁধতেছ মনে মনে, তা হচ্ছে স্বপ্ন! কারন ঘর বানাতে গেলে বাস্তবতা দরকার হয়। ঘরটা টিনের না খড়ের, ঘরে দরজা জানালা আছে কিনা, পাশ একটা ছাতিম গাছ আছে কিনা, তা দরকার হয়ে পড়ে।

কিন্তু কল্পনা অন্য রকম। সেখানে তুমি উড়ে উড়ে একটা সুতা নালী সাপ দেখতে পার। মনের দু:খে সেই সাপটি লোহার বাসর ঘরে গিয়া উপস্থিত হতে পার। কল্পনা হল ডানাঅলা ঘোড়া কিংবা বোরাক!
দুনিয়াতে তুমি যত বেশি কিছুর সাথে যাবা, মনে করবা, ততো দু:খের কাছে তুমি যাইতেছ। যত সুখ নিবা, ততো দু:খের কারণ তৈরি হবে। কম বয়সে কৌতুহলের কারণে তুমি ঝুঁকি নিতে পারো। সামনের দিনগুলি হিসাব করার ক্ষমতা হয় নাই বলে তোমার। ধারাবাহিকতা বুঝতে পার না। যত দিন যায়, যদি সতর্ক হও তুমি, কিছু ইশারা ইঙ্গিত বুঝতে পার, নিজেকে ততো গুটিয়ে নিতে পারবে।

আচ্ছা, ইদানিং তুমি যে এতো তন্দ্রা'র কথা বারবার বল, শে কে? তারে নিয়া এত কি?
তন্দ্রা হচ্ছে আমার প্রথম ক্র্যাশ। ক্লাশ এইটে ও ছিল ক্যাপ্টেন। আমার চেয়ে তখনো ও লম্বা, তবে সমান সুন্দরী।
তো?
ওর সাথে আমার অনেক কুল ব্যাপার আছে।
যেমন?
যেমন ধরো স্কুল থেকে আমরা গেলাম ভলিবল টুর্নামেন্টে। মমিসিং। বিদ্যাময়ী স্কুলের হোস্টেলে থাকার জায়গা হল। কয়েকটা দিন। সে কি

সময়! স্বাধীন স্বাধীন। সারাদিন খেলা, ঘাম, ধূলা বালি। সবাই এক একটা শাকচুন্নি। বিকালে হোস্টেলে ফিরে সবাই বাথরুমে। সময় কম। তাই গণ গোসল। আর জানোইতো, মেয়েরা নিজেদের সাথে যখন থাকে, ওরা খুব তোমাদের ভাষায় অশ্লীল হয়। যা তা বলে। যা তা কাপড় চোপড় পড়ে।

তন্দ্রা কি করলো?
একসাথে সাওয়ারের নিচে আমরা দুজন ভিজছি। খালি গা।
মানে কি? নাংগা বেটি?
হ
বাহবা বা। হেভি তো! তারপর?
তারপর আরকি! ও ছিল একটিভ। আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ছিল। জড়াইয়া ধইরা চুমাটুমা খাইয়া একাকার। আশেপাশের মেয়েরা তো থ। দেখতেছিল আমি কি করি!
তুমি কি করলা?
আমিও কম জাইনা। ধইরা এমন সোদন দিলাম, একেবারে আসলের মত। সবাই হাতাতালি দিয়া উৎসাহ দিছিল।
এতদিন পর তন্দ্রার সাথে আবার দেখা হবে নাকি?
হলে মন্দ হয়না। জিনিসটার শেষ দেখতাম! তবে মনে হয় তন্দ্রা'র মাথায় কিছু আছে। এমন ভাবে কথা বলে!

।১১।

আমার বিড়াল পোষা

ছোট বেলায় একবার এক মা বিড়ালকে ৫টা বাচ্চা সহ বাড়ি থেকে নিয়া বহুদূর ফেলাইয়া আসছিল। ঘর থেকে বের করার সময় মাটা খুব করে কানতে ছিল। হাউমাউ করে কান্না। কিন্তু তখন এত রাগ উঠছিল যে, কোনো মায়া আসে নাই। ফেলে দিয়ে আসার পর আম্মা তারে খুব বকা দিল। মনুষ্যত্ব নিয়া খোঁচা দিল। তখনই সে আবার ফিরে যায় সেই বিড়াল পরিবারটার কাছে। কিন্তু বিড়ালীনি তার ডাকে সাড়া দেয় নাই। কোন ভাবেই তার কথায় ফিরে আসে নাই।

আজ তিরিশ বছর পরে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। তোমার বরের ব্যবসা বিরাট হুমকির মধ্যে পড়েছে। ছোট ইনভেস্টররা টাকা ফেরৎ নিয়া গেছে। বিসনেস এমন খারাপ যে ব্যাংকে মান্থলি দিতে পারতেছো না। বসবাসের ফ্ল্যাটটা ও কি বিক্রি করে দিতে হবে? খুব টেনশন। এমন সময় বিড়াল পালা শুরু হল। পূরা বাসা গন্ধ হয়ে থাকে ওদের মুতে। দৈনিক ৬০/৭০ টাকার মুরগির গিলাকইলজা বালছাল আইনা রান্না করে খাওয়ায়। বিশ্রী। দৈনিক ঝগড়া হয় এ নিয়া। তারপরও এটা করব। শে বলল, শুধু পারসিয়ানটা রাখ। কালো বিড়াল। সে কিছুতেই রাজি হয় না। এরমধ্যে ৫টা বাচ্চা হয়ে গেছে।

একদিন কী এমন হবে যে, সব বন্ধুবান্ধব, ইতরামি ফাইজলামি বাদ দিয়া এই বিড়ালগুলির সাথে তোমার দিন কাটবে? সারাদিন রান্নাবান্না করতে আর কতক্ষণ লাগে। মন দিয়া করলে খেলাধূলাই তো মনে হয়। সৃজনশীল কর্ম। টবে বাগান করার মত। আসলে গাছচর্চাও ভাল

লাগেনা। খুব ধীরসুস্থির গাছেরা। নিজের মত করে বাঁচে। মানুষের কোন কিছুতে ভাগ বসায় না।

তোমার গ্রিপিন দিয়া যে মোচর দিতে পার, তার তূলনা আর হয় না।

কোনো মহিলাই চায় না, শে যা করবে তার কেউ বিচার করুক। শে চায় কখনো সাব হতে, কখনো ডম হতে। শে চায় সুইং করতে, বা সারাজীবন ভ্যানিলা সম্পর্ক।

শেষ অধ্যায়

তোমার বাসার কাছে গেছিলাম। ভাবলাম তোমার নতুন বাসাটা দেখে আসি। দুপুর হয়ে গেল কাজ করতে করতে। তারপর কাছে তোমার বাসা। ড্রাইভারকে দূরে বসিয়ে রেখে ঘন্টা দুই কাটালাম। তুমি বললে : খেয়ে যাও। পোলাও টোলাও রাধা ছিল। ডাইনিং টেবিলে বসে চামচ দিয়ে একটু খানি খেলাম। তোমার সামনে তো খেতে পারিনা। দেখি গলার নিচে আবেগ জমা হয়ে রয়েছে। সেখানে কোন খাদ্যবস্তু ঢুকবে না।

আরেক দিন তুমি এক গাড়িঅলা বন্ধুর সাথে ফিরবে বলে ঠিক করে আসছিলা। তোমার নতুন এক বন্ধু। সে গেল জ্যামে আটকে। আর এদিকে সেখানে এসে আমাকে ফোন করে জানাইছ যে তুমি আজ এখানে আসছো। আমার সাথে যখন দেখা হল, তখন তোমার ফোনে চার্জ নাই। আর দেখি তুমি তোমার গাড়িঅলা বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে মরিয়া হয়ে গেলে আমাকে দেখেই। আমারে বললা, চার্জার খুঁজে দাও। চিকন পিনের চার্জার।

আমি রাগ করে মুততে গেলাম ওয়াস রুমে। ওখানে গিয়ে হারিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।
ফিরে এসে দেখি, তুমি নাই।

মনে হয় এটাই তোমার সাথে শেষ দেখা হল।

+

না। আর নয়। বললাম, যতক্ষন মায়া আছে কিছু করতে পারছি না। মনে মনে বলি, আজ, এক্ষুনি আমার শেষ ২ভাগ মায়াও চলে গেল। তোমাকে আর না। এবার তোমাকে আমি শাস্তি দিবো। তোমার নাম বদল করে দিলাম 'ক্লোজড চ্যাপ্টার'।
বলে: তোমার ক্লোজড চ্যাপ্টার হয়ে আমি কি করব?
মনে মনে বললাম, ভিজায়া মুড়ি খাও। তবে বললাম না। শেষ ম্যাসেজের কোন রিপ্লাই দিলাম না। ও এতেই বুঝবে।

+

ইনবক্সে থাকা গত এপ্রিল থেকে রাখা সব ম্যাসেজ মুছে দিলাম। তাতে করে চ্যাটবক্স ও ডিলিট হয়ে গেল। এখন চাইলেও আমি বা শে অনলাইন আছে কিনা তা দেখতে পাব না। তার উপস্থিতি দেখতে চাই না।

+

ছাদে হাটছিলাম। খুব শূন্য শূন্য লাগল। ২৫শে ফেব্রুয়ারীর বিডিআর নিধন নিয়া দুপুরে নাড়াটাড়া করছি। আমার জীবনেও এমন একটা গণহত্যার দরকার ছিল। আমার মনে যে ভাবগুলি বেরোনোর পথ না পেয়ে পেটের ভিতর, অন্ত্রের ভিতর, প্লীহা-যকৃতে প্যাচখাইয়া রইছে যে ইচ্ছাগুলি, তাদের মুক্তি হৈত বা ধ্বংস হৈয়া যাইত।

আই ওয়ান্ট টু হাইড দ্য ট্রুথ

আই ওয়ান্ট টু শেল্টার ইউ
বাট উইথ দ্য বীষ্ট ইনসাইড
দেয়ার'স নোহয়ার উই ক্যান হাইড

+

ফেব্রুয়ারির হত্যাকাব্য সব ছাড়িয়ে যায়। দিনের আলোতে ৫৭ জন অফিসার হত্যা না শাস্তি! তবে মনে হয় শহরে ৫৭ জন বোম্বটে আসছিল, সবাইকে বিনাশ করা হৈছে। সকাল থেকেই থমথম করতে থাকল বাতাস। কি যেন হচ্ছে, কি যেন বদলে যাচ্ছে। ভাঙাচূড়া চলছে। ফিসফাস ফিসফাস। ফটোগ্রাফাররা নেমে পড়েছে মাঠে। গুলির পর গুলি ফুটছে। তবে পরে জানা গেল, গুলির চাইতে বেয়নেট ব্যবহার হয়েছে অনেক। মেরে মৃতদেহগুলি লুকানো হৈছে। ম্যানহোল দিয়ে পাচার করেছে বুড়িগঙ্গায়।

ক্যাম্পাসের ভিতরে গুপ্ত ঘাতকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল বিকালে। শহর এই দিকটায় অত্যন্ত ফাঁকা। বাতি নেবানো রাস্তার। সাতমসজিদ রোডে দোতলা উচু ট্যাংক নেমেছে। আবাহনি মাঠের পাশের রাস্তায় রেডি হয়ে আছে আরো কামান। মানুষজন দুচারজন যারা বিক্ষিপ্ত, কিন্তু কৌতুহলী, কেবলই ইতিউতি চায়, আর কাছে গিয়া ট্যাংক হাতায়। কাছে গিয়া দ্যাখে কি বিশাল উঁচু। দোতলা বারান্দায় একটা চালকের মাথা দেখা যায়। তারে জিগায়, কি হবে ভাই?

+

শেখ মুজিব নিয়া আমাদের খুব অভিমান ছিল। জীবিত থেকে প্রাক্তন শেখ বেশি জীবিত ছিলেন। কিন্তু আমরা কেউ চাই নাই মাইনাস শেখ। ফলে ৭৫ পরবর্তী কালটা খুব চাপা গুপ্ত আবেগের সময় যাচ্ছিল। আটাত্তরে জিয়া আসার পর সামরিক শাসন প্রলম্বিত হবে বুঝা গেল। তবু

তা তখনো দেশপ্রেমে মোড়ানো ছিল। ৭১এর পর মানুষের আকাংখা বেড়ে গেছে। সবাই চাচ্চিল দ্রুত উন্নতি হোক। কিন্ত কিছুই হচ্ছিল না।

+

: আমার নেশা ছিল ফেলানো, অতি সাধারণ পুরুষজাতটাকে একেবারে রূপের ঝলকে আজীবনের জন্য বন্দী করা।

আমাকে আর পাবে না, কিন্তু আমৃত্যু কামনা করে যাবে।

আর আমার নেশা কী ছিল? রূপকে রূপহীনতায় রূপান্তরিত করা। তাইতো আমি সারাজীবন তাদেরকে পড়ার আগ মুহূর্তে হারিয়ে ফেলতাম।

+

:: আমি যদি আমার নেশায় পড়তাম, তাহলে আমি যা যা পছন্দ করি তা দিয়ে তাকে নৈবেদ্য দেবার চেষ্টা করতাম। আমি দিতাম গোলাপ, দিতাম কলম, একটা বাক্স ভর্তি কথা ভরা সঙ্গ, একটা নৈকট্য।

আমি কি স্যাপিও সেক্সুয়াল? মেধা আমারে উত্তেজিত করে। আমি তো আবেগ কে ভয় ভাই। ডেমিসেক্সুয়ালদের থেকে আলগোছে দূরে চলে যাই। আর তোমার তো মেধা নাই।

নাকি তোমার মেধা আমি বুঝতে পারি নাই? শুধু রূপটাই দেখেছি। তোমার দেহটাই আমার মেধার মুকুটে রস সিঞ্চন করেছে। আমাকে সেই রকম অন্ধ করে দিয়েছে।

তুমি তো কেমন হৈয়া গেছ
কেমন? মনস্টার?
কারো জন্য মন স্টার, কারো জন্য মনস্টার

তোমার জন্য কি?
আমার জন্য এক টুকরা দ্বীপ, হারাতে চাইনা এমন একটা আশা
কিন্তু দ্বীপ তো ডুবেও যায়
পাথরের দ্বীপ ডোবে নাকি? জানিনা তো!
পাথরের দ্বীপ আছে না কি?
নরম প্যাঁচপেঁচে ঘন পলির দ্বীপে তো যাই না
একটা দ্বীপ অবশ্যই আছে, যেটার কোন বীচ নাই
খাড়া পাথুরে কর্কষ
ঢোক গেলার পানিও নাই।
তুমি থাকলে বলতে: আহারে

কখনো কখনো সেখানে বাঁচতে গেলে নিজের মুত পান করতে হয়।
নিজের মাংশ খাইয়া বাঁচতে হয়।
এইটা দারুণ বলছো।
আবার সেই দ্বীপটাকে বানাইয়া টেবিলে বসে সেই দ্বীপটার বাশিন্দাদের জন্য খানিকটা মন খারাপও করা যায়।

কলিজা ছিরিয়া দেখনা আসিয়া
লিখেছি আমি তোমার দয়াল তোমারি নাম
সে মূলে তুমি বাবা লেংটা সুলেমান

কালো চশমা দিয়া দেখি তুমি সুন্দর।

শেষ কথা:

প্রথম বার না হলেও, জানোই তো, এরকমই হয়। হয়ে আসছে। বারবার তোমার শরীর কাঁপতে থাকবে, পেশিগুলি থরথর করব। তুমি শ্বাস নিতে পারবে না। তোমার হিক্কা উঠবে। কানতে কানতে তোমার রানে রান ঘষবে, তবু শ্বাসকষ্ট হবে। প্রথমবার সামান্য বিচ্যুত হলে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে। সে আকাশে গোধূলির ধোয়াটে ক্ষয়আলো। গালে কান্নার দাগ বসে গেছে, তার ওপর সামান্য পাউডার বুলিয়ে তুমি এসে আবার পৃথিবীর ল্যাম্পোষ্টের নিচে এসে দাঁড়াবে। আকাশে চাঁদ উঠবে না।

তুমি মাথা নিচু করে দাঁড়াইয়া থাকবা, দিগন্ত তখন চরম শান্ত! তুমি তোমার ব্যাকপ্যাক বেঁধে নিয়া পিছন পানে হাটা শুরু করবা। যেতে থাকবা আবার দাঁড়াবা। থামবা কিন্তু চলতে থাকবা।

তোমার নিহত মুখমণ্ডলে কথার জিন আটকাইয়া গেছে। কথা শুনলেই তোমার মুখ নড়ে ওঠে না।

আমি বুঝতে পারি, আমার অর্ধেকটা মন ভাল হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেক হাবুডুবু খাচ্ছে এখনো। ভাঙ্গনের যে নেই পারাপার, আমি, শে সব একাকার!